৮ জানুয়ারি ১৯৮৬ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

সুমীত ব্যবহারে বহুবিধ সুবিধে

এই মেশিনের সব কাজ তার প্রাণকেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত

এর হেভী ডিউটি মোটর না থেমে ৩০ মিনিট চলতে পারে।
বিশেষ ডিজাইনে তৈরী চারটি ব্লেড ও অল্প পরিমাণ পেষাই করার ক্যাপযুক্ত
এই সুমীত ডোমেস্টিক কিচেন মেশিন কত সহজে রান্নার
মূল সরঞ্জাম বানিয়ে দেয়।

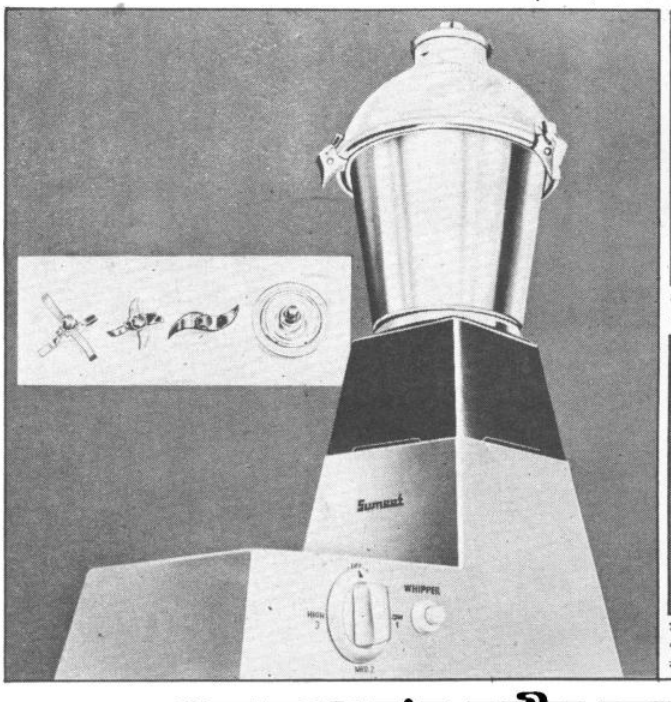

লঙ্কা আর গরম মশলা
২ মিনিটে শুকনো পেষাই।

কড়াই ডাল, চাল ও নারকোলের
শাঁস ২ মিনিটে ভিজে পেষাই।

মাংস কিমা করে ১ মিনিটে আর
গাজর, পেঁয়াজ, নারকোল ও বাদাম
কুরে দেয়...কয়েক সেকেণ্ডে।

লাসি, দুধ আর ডিমের সাদা
অংশ ফেটায় ১ মিনিটে।

এখন যোগ হ'ল সুমীত ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট

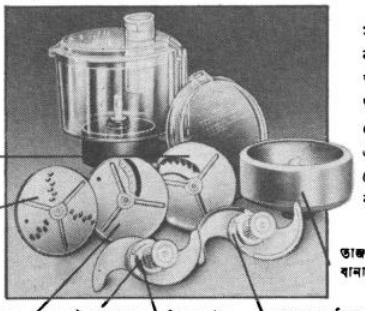

সুমীত আপনাকে দিচ্ছে আর একটা বিশেষ সুবিধে—
নতুন ঐচ্ছিক ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট লাগিয়ে
আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন! এতে আছে স্বচ্ছ
অথচ ভাঙ্গে না এমন একটি ৩.৮৮ লিটারের পাত্র,
৫টি বদলযোগ্য ব্লেড ও ডিস্ক আর রস করবার যন্ত্র।
এই অ্যাটাচমেণ্টটি আপনি আপনার সুমীত ডোমেস্টিক
বেসিক ইউনিটে লাগিয়ে দিন, ব্যস্, আর দেখুন
কী বিস্ময় সৃষ্টি করে!

সুমীত®

৪০০ ওয়াট ২২০-২৪০ ভোল্ট~ ৩০ মিনিট রেটিং

শক্তপোক্ত রান্নার ঝক্কি সামলাতে শক্তপোক্ত ভাবে তৈরী।

আমাদের বিনামূল্যে প্রদর্শনী দেখার অপেক্ষায় থাকুন আর সুমীত আপনার কি কি কাজ কি ভাবে করছে—চাক্ষুস দেখুন।

সার্ভিস সেণ্টার ঃ

কলকাতা ঃ কে দত্তপানি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা. লি, ৫৫, এজরা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোন ঃ ২৬৬৭২৮/২৯। সুমীত সার্ভিস সেণ্টার (দক্ষিণ) পি-৪১৮ কেয়াতলা রোড, দু'তলা, কলকাতা-৭০০ ০২৯ ফোন ঃ ৪৬৬১১৬। **গৌহাটী ঃ** এইচ. ভি. ট্রেডার্স, ডুগার বিল্ডিং,ফ্যান্সী বাজার, গৌহাটী, আসাম-৭৮১০০১ ফোন ঃ ২৮০২৮

OBM/3187 BEN

আনন্দমেলা

২৪ পৌষ ১৩৯২ । ৮ জানুয়ারি ১৯৮৬ । ১১ বর্ষ ২০ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

আবার কুমেরু অভিযান । বিমলেন্দু ভট্টাচার্য ৩২

গল্প, বড়গল্প

জরুরি চিঠি । আলোক সরকার ৫

হারু গেল হারিয়ে । বিজনকুমার ঘোষ ১৩

জোড়া শালিক । অমল আচার্য ২৭

লালমনুয়া । সত্যেন্দ্র আচার্য ২৯

ভ্রমণকাহিনী

মুক্তমঞ্চ মিনাক থিয়েটার । সলিল লাহিড়ী ৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৬

শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ৫৫

শার্লক হোমসের গল্প

বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫১

বিজ্ঞানবিচিত্রা

সময়ের কম-বেশি । সুব্রত রায় ১১

এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২৪

সিল । বিশ্বজিৎ পাণ্ডা ২৫

জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫৪

ছড়া, কবিতা

আমাদের মালি । প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৮

দাশরথি পানিক্কর । হিমাংশু জানা ৮

ভাইটি । প্রমোদ বসু ৮

শীতেরও শীত লাগে । সুদেব বকসি ১২

অথচ দুঃখ । প্রভাকর মাঝি ১২

লেখাপড়া

পুঙ্গব···পরিবাদ··· (অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ২৬

দেশী জিনিস (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ২৬

খেলাধুলো

নিউজিল্যান্ডের সিরিজ জয় । মণীশ মৌলিক ৬২

আশির পরে হাসি । অশোক রায় ৬৩

ছিয়াশির আগাম সম্মান । সুব্রত সিংহ ৬৪

ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা দারুণ ফর্মে । রাজা গুপ্ত ৬৫

দিব্যেন্দু দাবায় 'অর্জুন' । নৃপতি চৌধুরী ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১

সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০

অন্যান্য আকর্ষণ

তোমাদের পাতা ৪৯, ডাক্তারবাবু বলছেন'৫৪

ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮, মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

তালমিছরির
জগতে
প্রবাদ পুরুষ
দুলাল চন্দ্র
ডড়ের
তালমিছরি

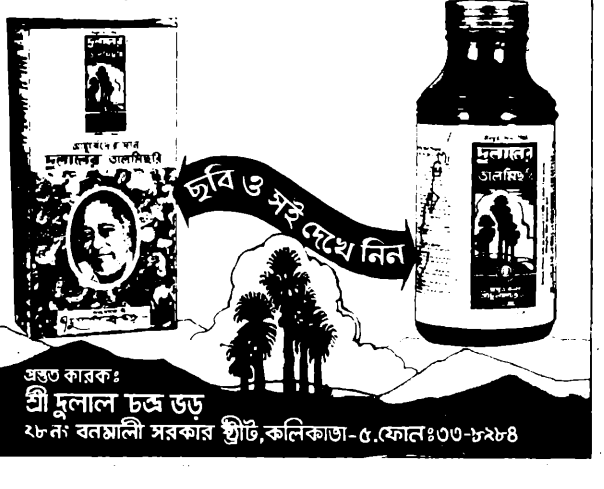

প্রস্তুত কারকঃ
শ্রী দুলাল চন্দ্র ডড়
২৮নং বনমালী সরকার স্ট্রীট,কলিকাতা-৫.ফোনঃ৩৩-৮২৮৪

এক

সুপার ফাইটার

কি ক'রে দাঁতের গর্তের সঙ্গে যুদ্ধ করল।

একদিন আমার ছেলে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল...

"মা, মা, অনিলের দাঁতে পোকায় বাসা করেছে"

"মানে, দাঁতে ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়েছে, সোনা"

দাঁতে গর্ত ?

তাকে বোঝালাম, কি ক'রে দাঁতকে একনাগাড়ে কত হাঙ্গামা সইতে হয়...

"দাঁতে গর্ত হওয়ার কারণ হল, দাঁতের ফাঁকের খাবারের কণায় জীবাণু জন্মে একরকম অ্যাসিড তৈরী করে, যা দাঁতের এনামেলের ওপর হামলা করে"

...আর, ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড কি ভাবে কাজ ক'রে ওর দাঁতে সুরক্ষিত রাখে...

"ফরহ্যান্স ফ্লোরাইডের ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে সত্যি-সত্যিই দাঁত শক্ত করে..."

..." ফলে, জীবাণু দাঁত ভেদ ক'রে গর্ত করতে পারে না "

"হুঁ হুঁ, আমার স্বাদওয়ালা, ফেনাওয়ালা

সুপার ফাইটার

আর, তার ওপর,
ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড দেয়
ফরহ্যান্স-এর সেই সুবিখ্যাত যত্ন !

ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড মাড়ি সঙ্কুচিত করে, ক্ষয়ের মোকাবিলা করে।

404-GM-244 BEN

জরুরি চিঠি

আলোক সরকার

শ্যামাপদ নতুন বিয়ে করেছে। রবিবারের দুপুরবেলায় কলকাতায় তার ঘরে শুয়ে আছে, কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দ্যাখে, রোগা-মতন একটা লোক। কেমন গম্ভীর-গম্ভীর উদাসীন-উদাসীন চেহারা। কোনও কথা না বলে পকেট থেকে একটা খাম বার করে তার হাতে দিল।

খাম খোলারও তর সইল না, দ্যাখে, লোকটা রাস্তার প্রায় অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে। দু-একবার তবু চেঁচিয়ে ডাকল, "ও মশাই, একটু দাঁড়িয়ে যান।" কানেও পৌঁছল না ডাক।

কী আর করা যায়! খাম খুলে ভিতরের কাগজটা টেনে বার করল। অনিমেষ, তার বউয়ের ভাই, চিঠি লিখেছে। জানিয়েছে, এক্ষুনি তাকে একবার গোবরডাঙা যেতে হবে, ভীষণ দরকার।

গোবরডাঙা শ্যামাপদর শ্বশুরবাড়ি। তার বউ এখন গোবরডাঙায় আছে।

এইরকম চিঠি পাওয়ার পর তো আর বসে থাকা যায় না। শ্যামাপদ তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল। সাড়ে তিনটের একটু আগে-পরে একটা ট্রেন আছে বলে মনে পড়ল তার। সেটা যদি ধরা যায়, আর ট্রেন যদি ঠিক সময়েই পৌঁছয়, তা হলেও পৌঁছতে-পৌঁছতে পাঁচটা বেজে যাবে। শীতকালের দিন, অর্থাৎ তখন প্রায় অন্ধকার।

শিয়ালদায় এসে দেখল, গাড়ি ছাড়তে তখনও মিনিট দশেক দেরি। ধীরেসুস্থে ট্রেনে উঠে জানলার ধারেই একটা বসার জায়গা পেয়ে গেল সে। আর বসেই তার প্রথম ভাবনা হল, ভীষণ দরকারটা কী হতে পারে।

গোবরডাঙায় এর আগে সে মাত্র একবারই গেছে। অর্থাৎ বিয়ের দিন। শ্বশুরবাড়ি গোবরডাঙার ঠিক কোথায়, স্পষ্ট জানা নেই তার। তবে স্টেশনের খুব কাছে যে, এটা তার জানা, আবছা-আবছা একটা পথও মনে পড়ছে তার। সেই পথ ধরে এগিয়ে একটা বাঁক নিলেই সামনে পড়বে

পোস্টআপিস, তার প্রায় মুখোমুখি তার শ্বশুরবাড়ি।

খুঁজে নিতে তেমন কিছু কষ্ট হবার কথা নয়।

সারা রাস্তা খুব উদ্বেগের মধ্যে কাটল। বারবার ঘড়ি দেখল, বিয়েতে পাওয়া নতুন ঘড়ি। এই বনগাঁ লাইনে গাড়ি মাঝে-মাঝেই থেমে যায়, এ অঞ্চলে এখনও তো ডবল লাইন হয়নি। যত বেশি বার থামবে পৌঁছতে তত বেশি দেরি। ওদিকে অন্ধকার হয়ে আসবে। সে শহরের লোক, সঙ্গে টর্চ রাখার কোনও অভ্যেস নেই তার। অন্ধকার হলে অসুবিধেয় পড়তে হতে পারে তাকে।

কিন্তু স্টেশন থেকে আর কতটুকুই বা পথ।

গোবরডাঙায় যখন ট্রেন এসে থামল, তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে সে ঘড়ি দেখল। খুব বেশি দেরি হয়নি, ঘড়িতে কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটা কুড়ি। শীতের দিনে অন্ধকার নেমে এসেছে অবশ্য, স্টেশনের আলোগুলো জ্বলছে, তবু গাছের মাথায়-মাথায় এখনও ছায়া-ছায়া আলোর রঙ দেখা যাচ্ছে।

স্টেশন থেকে আর কতটুকু, সে হেঁটেই চলে যেতে পারবে। তিন-চার মিনিটের বেশি লাগবে বলে মনে হয় না। স্টেশনের বাইরে এসে সে হাঁটতে শুরু করল। স্টেশনের বাইরে অনেক দোকান, দোকানের আলোয় রাস্তা ঝলমল করছে। কিন্তু একটু এগোতেই পথ অন্ধকার হয়ে এল। তবু আবছা একটা আলো এখনও আছেই। সে দু'পাশ দেখতে-দেখতে চলল। নতুন জায়গার পথ দেখতে কার না ভাল লাগে!

আমবাগান, আমগাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে নারকেলগাছ। একটা পুকুর, তার পাশে বনতুলসীর ঝোপ, একটা ব্যাঙ লাফিয়ে নামল জলে।

তার হঠাৎ খেয়াল হল, অনেকক্ষণ পথ হাঁটছে সে। এতক্ষণ তো লাগার কথা নয়। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, অর্থাৎ দশ মিনিটেরও বেশি পথ হাঁটছে সে। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, নতুন ঘড়ির রেডিয়াম-দেওয়া কাঁটা জ্বলজ্বল করছে।

তা হলে পথ ভুল করেছে সে। যেদিকে যাবার কথা তার উলটো দিক ধরেছে নাকি! নির্জন পথ, আশেপাশে কোনও বাড়িও দেখা যাচ্ছে না। শ্যামাপদর মনে হল, যে-পথে এসেছে আবার সেই পথেই ফিরে যাওয়া ভাল। তা হলে অন্তত স্টেশনে পৌঁছনো যাবে। কিন্তু এইটুকু আসতে কতবার বাঁক নিয়েছে সে, সব বাঁকগুলো মনে পড়বে তার?

হঠাৎ দ্যাখে খুব কাছ দিয়েই কে একজন যাচ্ছে। অন্ধকারে মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না, তা ছাড়া শীতের দিনে প্রায় সারা শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। যাই হোক, ভগবান আছেন। প্রায় দৌড়ে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বলল, "বলতে পারেন এখানে পোস্টআপিসটা কোন্ দিকে?"

"কোন্ পোস্টআপিস?" ভদ্রলোকের গলা একটু ধরা-ধরা।

"খাঁতুরা পোস্টআপিস।"

খাঁতুরা পোস্টআপিসের সামনে পৌঁছতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই।

"খাঁতুরা পোস্টআপিস? সে তো প্রায় সামনেই। আপনি সোজা কিছুটা গিয়ে প্রথম ডান দিকের পথে বাঁক নিয়ে কিছুটা এগোলেই দেখতে পাবেন।"

যাক্ বাঁচা গেল! ভদ্রলোক আর কোনও কথা না বলে উলটো দিকের পথে চলে গেলেন। দেখা যাক এখন প্রথম ডান দিকের পথ।

কিন্তু কোথায় ডান দিকের পথ। কুয়াশায় অন্ধকারে কিছুই তেমন স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না, সে ডান দিকের পথ পিছনে ফেলে এল নাকি। তা প্রায় আট-দশ মিনিট তো চলা হল। তার কেমন ভয় করতে লাগল। পথ একেবারে নির্জন। বাড়ি-ঘরও তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না, যা দু-একটা, তাও অন্ধকার।

শেষ পর্যন্ত ডান দিকে একটা পথ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে পথেরও কি শেষ আছে? চলেছে তো চলেইছে। দু'পাশে বড় বড় গাছ, গাছের তলায় ঝরে-যাওয়া পাতার খসখস শব্দ।

ভয়ে, দুশ্চিন্তায়, পরিশ্রমে কপালে ঘাম জমে উঠেছে শ্যামাপদর, এমন সময় দ্যাখে, কে একজন প্রায় পাশেই দাঁড়িয়ে। ভাল করে দেখে চিনতে পারে, চাদর-জড়ানো আগের সেই ভদ্রলোক। তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "কী, এখনও খুঁজে পেলেন না? আশ্চর্য! এই তো প্রায় এসেই গেছেন, আর একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে দু'পা গেলেই খাঁতুরা পোস্টআপিস।"

কথা ক'টা বলে ভদ্রলোক আর একটুও দাঁড়ালেন না। অন্ধকারের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। ভদ্রলোককে থামাতে পারলে সে তাঁকে পোস্টআপিস পর্যন্ত পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানাত। কিন্তু অন্ধকারে ভদ্রলোককে আর দেখাও যাচ্ছে না।

কী আর করা! সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের পথ খুঁজতে হবে। মনে-মনে একটু ভরসা হচ্ছে অবশ্য, বোধহয় শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে সে।

কিন্তু কোথায় বাঁ দিকের পথ! দশ-বারো মিনিট হাঁটার পর যদিও-বা বাঁ-দিকে কাঁটাঝোপ-ভরা একটা সরু গলি মেলে, সে-পথে যতই এগোয়, পথ আর ফুরোয় না। সে গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে তার আর কোনও উদ্ধার নেই। সারা রাত এমনিই তাকে ঘুরে মরতে হবে। এই শীতে, এই অন্ধকারে! এর পরিণতি কী, ভাবতে তার সারা-শরীর হিম হয়ে এল।

ঠিক এমন সময় আবার পাশেই সেই ভদ্রলোক। ধরা-ধরা গলায় বললেন, "কী আশ্চর্য, এখনও ঘুরে মরছেন! ওই তো সামনেই।"

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শ্যামাপদ বলল, "আপনি নিজে যদি একটু পোস্টআপিসের সামনে পৌঁছে দেন, ভারী উপকার হয়। এই অন্ধকারে দেখছেন তো কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।"

ধরা-ধরা গলায় ভদ্রলোক বেশ জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, "আমার পিছন-পিছন আসুন, এই তো দু-এক মিনিটের পথ।"

বাঁ দিকের ঝোপঝাড়ের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "ওই যে আলো-জ্বলা একটা ঘর দেখছেন, ওইটেই আমার বাড়ি। আসুন, একটু চা খেয়ে যাবেন।"

ঘড়িতে প্রায় সাতটা। শ্যামাপদ বলল, "আজ আর নয়, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপনি তো এখানকারই লোক, আর একদিন হবে।"

ভদ্রলোক বললেন, "আর একদিন আবার কেন ! কতক্ষণই বা লাগবে। একে এই শীত, তার উপর এতটা ঘোরা। এক কাপ চা খেয়ে নিন, দেখবেন কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।"

ভদ্রলোককে চটাতে ভয় হল। এখন ওঁর কথামতো কাজ করাই ভাল। রাজি হয়ে গেল শ্যামাপদ চা খেতে।

ভদ্রলোক হনহন করে এগিয়ে চলেছেন, পিছন পিছনে চলেছে শ্যামাপদ। বেশিদূর যেতে হল না। উপরে টিন-দেওয়া ইটের দেওয়ালের একটা ঘরে ঢুকবার আগে ভদ্রলোক পিছন ফিরে বললেন, "আসুন।"

ঘরের ভিতর খুব ম্লান আলোর কুপির মতন কী একটা জ্বলছে। তার চারদিক ঘিরে অনেক লোকজন। সকলেরই প্রায় সারা শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। মুখ নিচু করে তারা নিজেদের মধ্যে কী যেন কথা বলছে।

ভদ্রলোকের পিছন-পিছন শ্যামাপদ ঘরে ঢুকবার সঙ্গে-সঙ্গে তারা সবাই মুখ উঁচু করল। শ্যামাপদ দেখল, তাদের ভুরু কেমন যেন কুঁচকে উঠছে। কোথায় যেন খুব একটা সন্দেহ হচ্ছে তাদের।

তাদের মধ্যে একজন ম্লান আলোর কুপির মতন জিনিসটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত উঁচু করে কুপিটা মুখের সামনে ধরল তার।

সঙ্গে-সঙ্গে সবাই বলে উঠল, "আরে, এ তো সে নয় !"

আর অমনি একসঙ্গে দশ-বারোটা হাত ভীষণ জোরে ধাক্কা দিল তাকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল শ্যামাপদ, একরাশ বাসনপত্র, চেয়ার-টেবিল একসঙ্গেই চারদিকে আছড়ে পড়ল তার। কী ভীষণ শব্দ !

ভয়ে আতঙ্কে বিহ্বল শ্যামাপদ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে দেখল, সে স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ করে এইমাত্র ট্রেন ছাড়ল, তার পাশ দিয়ে ট্রেন চলেছে বনগাঁর দিকে।

আলো-জ্বলা প্লাটফর্ম লোকজন ফেরিওলা সব কত স্বাভাবিক। সে অবাক হয়ে চারদিকে চাইল। হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল তার। পাঁচটা বেজে একুশ মিনিট।

সে এতক্ষণ প্লাটফর্মেই দাঁড়িয়ে ছিল ? এতসব ঘটনা কোনও কিছুই ঘটেনি তা হলে !

এমন নাকি মাঝে-মাঝে হয়। সে শুনেছে। এইরকম বিভ্রম কখনও-কখনও কারও-কারও জীবনে ঘটে। তারও এমন ঘটল নাকি ! তবু কত স্পষ্ট সে সব মনে করতে পারছে। সবগুলো পথ, পথের পাশের ছবি।

সারা শরীর ঝিমঝিম করছে তার।

সে ঠিক করল আর হেঁটে যাওয়া নয়। স্টেশন থেকে বাইরে এসে একটা রিকশায় উঠল।

খাঁতুরা পোস্টআপিসের সামনে রিকশা এল দু'-তিন মিনিটেই। পোস্টআপিসের উলটো দিকে একটু ওপাশে তার শ্বশুরবাড়ি। শ্যামাপদ দেখেই চিনতে পারল। বাড়ির ভিতর আলো জ্বলছে। দরজা বন্ধ।

বাগান পার হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় শব্দ করল শ্যামাপদ। একটু পরেই দরজা খুলল।

দরজার ওপাশে বাড়ির তিন-চারজন। সবাই যেন খুব অবাক হয়ে গেছে। সবার মুখ কেমন যেন প্রশ্ন মাখানো। শ্যামাপদ স্পষ্ট বুঝতে পারল, এ-সময় ওরা কেউই আশা করেনি তাকে।

শ্যামাপদর খুব খারাপ লাগল। বেশ রাগও হল তার। এ কী রকম ব্যাপার। সে তো আর এমনি আসেনি, রীতিমতো চিঠি পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়েছে তাকে।

তার বউও এসে সামনে দাঁড়িয়েছে, তার চোখেও কেমন যেন অপ্রস্তুত ভাব।

শ্যামাপদ বলল, "অনিমেষের চিঠি পেয়ে এলুম। কী সব জরুরি দরকার-টরকার লিখেছে।"

"চিঠি !" তিন-চারজন অস্ফুট বিস্ময়ভরা গলায় বলল। তাদের মধ্যে অনিমেষও আছে।

শ্যামাপদ পকেট থেকে খামসুদ্ধ চিঠিটা টেনে বার করে অনিমেষের হাতে দিল। এটা রীতিমত মান-সম্মানের ব্যাপার। বিনা নিমন্ত্রণে সে শ্বশুরবাড়িতে আসতে যাবে কেন !

অনিমেষ খাম থেকে চিঠিটা বার করল। সাদা ভাঁজ-করা কাগজ, অনিমেষ ভাঁজ খুলল তার। তারপর অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে চাইল।

সবাই ঝুঁকে পড়ল চিঠির দিকে। শ্যামাপদও মাথা বাড়াল।

সাদা ধপধপে কাগজ, সেখানে একটা অক্ষরও লেখা নেই।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

আমাদের মালি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আমাদের মালি ছিল
গালি দিত গাছকে,
জল ঢেলে বলত সে :
"ফুল চাই আজকে,
চটপট ফুটে ওঠো
বিকেলের মধ্যে,"
এই বলে, বকত সে
গদ্যে ও পদ্যে।

একদিন হল কী যে
ভয়ানক কাণ্ড !
গাছের গোড়ায় মালি
ঢালে মধুভাণ্ড।

চটপট ফুটে গেল
সবগুলো ফুল তো,
মালি বলে : দেরি হলে
পাপড়ি কি খুলত !

গাছও কম দুষ্টু না
তাড়াতাড়ি করে,
ফুলগুলো নীচে রাখে
কাণ্ড উপরে !

মালি রেগে টং-বং
গালি দেয় খালি,
শুধু আমাদের খোকা
দেয় হাততালি !

দাশরথি পানিক্কর

হিমাংশু জানা

দাশরথি পানিক্কর,
সতীর্থ যাঁর মানিক কর,
চেনো তাঁকে ? দীর্ঘ নাক,
বাঁ কান ঘেঁষে ঈষৎ টাক,
ঘাড়ের ওপর কালচে দাগ।
থাকেন অন্ধ্রে বেশিরভাগ
সময় এলেই আন্দুলে
মামার সঙ্গে প্রাণ খুলে
ধামার ধরেন, গোঁফে তা
দিতে গিয়ে ফেলেন চা।
মা বেঁচে নেই, বুড়ো বাপ
ত্রিবাঙ্কুরে খেলান সাপ।

ভাইটি

প্রমোদ বসু

বাবা দেন কিল চড়
মা ধরেন কান,
রেগে গেলে দাদা খুব
জোরে ধমকান।

দিদি খুব রাগী, তাঁর
বিখ্যাত ঘুসি,
পিঠে দেন দুদ্দাড়
যতগুলো খুশি।
মারে না তো একজন,
বকাবকি নেই,
ভালবাসি ভাইটিকে
এই জন্যেই।

ছবি : অনুপ রায়

আটলান্টিকের ধারে মিনাক থিয়েটার। মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে মুক্তমঞ্চ

মুক্তমঞ্চ মিনাক থিয়েটার

সলিল লাহিড়ী

পাহাড় আর সমুদ্র আমাকে বারবার ঘরছাড়া করে। পাহাড় যখন টানে তখন মনে হয় মাটির পৃথিবী ছেড়ে নীল দিগন্তের কাছে চলেছি। আর অতলান্ত সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়ালে সমস্ত বাধা-বন্ধন মুছে যায়। মনটা হাল্কা হয়ে ভেসে যায় ঢেউয়ের দোলায়।

সবাই যখন ব্রিটিশ আইলস-এ বেড়াতে যায় তখন লণ্ডন বা তার আশপাশেই ঘুরে বেড়ায়। আমার কাছে কিন্তু লণ্ডন, কেন্ট, ব্রিস্টল বা শেফিল্ডের মতো জায়গা তত লোভনীয় নয়, যত বেশি লোভনীয় কর্নওয়ালের শহর ট্রুরো। আমার এক আত্মীয়ও তাই আমাকে বলেছিলেন,'যানজটের শহর কলকাতার ভিড়ভাট্টা ছেড়ে আর-এক শহরে ঢুকছেন কেন ? বরং একবার চলে আসুন ট্রুরোতে। দেখবেন পাহাড় আর সমুদ্র কেমন মিতালি পাতিয়ে আছে ! নরম সবুজে ঢাকা উপত্যকার এমন নিখুঁত ছবি আর কোথাও পাবেন না। এর সঙ্গে আছে ব্রিটিশ আইল্যাণ্ডের শেষ প্রান্তভূমি ল্যাণ্ডস এণ্ড। তার খুব কাছেই রয়েছে মুক্তমঞ্চ মিনাক থিয়েটার। প্রকৃতির এরকম অফুরন্ত সৌন্দর্য আর কোথায় পাবেন !' এমন সাদর আমন্ত্রণ ! সাড়া না-দিয়ে পারি ! চলে গেলাম ট্রুরোতে।

আমার আত্মীয় অহীন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী ক্যাথলিন সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানালেন। ওঁদের ছেলেমেয়ে শন, দেব, রণ আর মারিয়াও মিষ্টি হেসে বলল, "ওয়েলকাম।"

আমি অহীন্দ্রনাথকে বললাম, "লণ্ডন, কেন্ট, ব্রিস্টল, শেফিল্ড ছেড়ে পাহাড় এবং সমুদ্র দেখব বলে এখানে এসেছি। নিরাশ হব না তো !"

অহীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন, "দু-একদিন থেকেই দেখুন না। দেখবেন, কখন নিজের অজান্তেই ছুটিটা বাড়িয়ে ফেলেছেন।"

প্রথম দু-তিনদিন ট্রুরো শহরের ধারেকাছে ঘুরে-ঘুরে অনেক কিছু দেখলাম। মার্কেটিং সেন্টার, ট্রুরো স্কুল, চার্চ, ক্যারাভান, পার্ক। তাতে মন ভরল না। আত্মীয়-ভদ্রলোককে বললাম, "কোথায়, তেমন কোনও মন-ভরানো প্রাকৃতিক দৃশ্য তো দেখতে পেলাম না !"

উনি বললেন, "চলুন, কালই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি ল্যাণ্ডস এণ্ড এবং মিনাক থিয়েটারে। দেখে বলবেন মন ভরল কি না।"

ল্যাণ্ডস এণ্ড। ব্রিটিশ আইল্যাণ্ডের শেষ প্রান্তভূমি। সমুদ্র

দিয়ে ঘেরা। আটলান্টিক সমুদ্রের ধারে বসে একটা গ্রুপ-ফোটো তোলা হল। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে তাকালাম। দূরে বিন্দুর মতো ভেসে যাচ্ছে ব্রিটিশ ওয়াচ-শিপ। এরাই দিন-রাত সি কোস্ট পাহারা দিচ্ছে। ল্যাণ্ডস এণ্ডের কাছেই আছে ব্রিটিশ নেভাল বেস। জলদস্যুরা এখানে আসত। দূরে জলদস্যুদের একটি জাহাজের ভাঙা টুকরো পড়ে থাকতে দেখলাম। এর পর গেলাম মুক্তমঞ্চ মিনাক থিয়েটার দেখতে।

মুক্তমঞ্চ অনেক দেখেছি। কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের ধারে সি. আই. টি'র মুক্তমঞ্চও আমার দেখা। বোম্বাইতেও ওপেন সিনেমা হল দেখেছি সমুদ্রের কিছু দূরে। কিন্তু এইসব মুক্তমঞ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাথার উপর ছাদ নেই। এভাবেই আকাশ দেখানো হয়েছে এইসব মুক্তমঞ্চে। কিন্তু এই মিনাক থিয়েটার একেবারেই অন্যরকম।

মিনাক থিয়েটারের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, চোখ জুড়িয়ে গেল। পাহাড় কেটে-কেটে অর্ধচন্দ্রাকার গ্যালারি ধাপে-ধাপে নেমে গেছে। গ্যালারির নীচে পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে গোল স্টেজ। পিছনে অর্ধবৃত্তাকার একটুখানি দেওয়াল। তার পিছনে আটলান্টিক সমুদ্রের উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস। দেখতে-দেখতে মনে হল, এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছি! এ কি ব্রিটিশ আইল্যাণ্ডের কোনও জায়গা, নাকি দু'হাজার বছরের পুরনো রোমান সাম্রাজ্যের কোনও শহরের ভগ্নাবশেষ!

গ্রানাইট পাহাড় কেটে কেটে তৈরি করা হয়েছে মিনাক থিয়েটারটি। ল্যাণ্ডস এণ্ড এবং লোগন রকের মধ্যে গ্রানাইট ক্লিফের ফাঁকে পোর্থকুনো বে'র মধ্যে তৈরি এই থিয়েটার। শুধু এ-দেশে কেন, সারা পৃথিবীতে এটিই বোধহয় একমাত্র মুক্তমঞ্চ, যা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে।

টিকিটঘরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে ছিলেন। ওঁর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, এই মিনাক থিয়েটারের ঢালু গ্যালারি এরকমভাবেই ছিল, নাকি তৈরি করা হয়েছে।

ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মিনাক থিয়েটারের কেয়ারটেকার। নাম এডি। শুরু থেকেই উনি এখানে আছেন। একটু হেসে বললেন, "আগে শুনুন, কেন এমন করে এই থিয়েটার বানানো হল। রাওনা কেড ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক। খোলা আকাশ, উদ্দাম জলরাশি এবং পর্বতমালার মধ্যে যে মোহময়তা আছে, বদ্ধ ঘরে তা পাওয়া যায় না; এ-কথা এই ভদ্রমহিলা জানতেন। শিল্পকলায় রোমান সাম্রাজ্যের অবদানের কথা মনে রেখে রোমক স্থাপত্যের ঢঙে ১৯৩২ সালে বানিয়েছিলেন এই থিয়েটার।"

সত্যিই অপূর্ব। থিয়েটারের দু'ধারে উঁচুতে দুটো ঝুলন্ত ব্যালকনি, ঠিক থিয়েটারের বক্সের ঢঙে বসানো। গ্যালারিতে বসে স্টেজের দিকে তাকালাম। সমুদ্রের দুরন্ত বাতাস সারা গায়ে একটা ঠাণ্ডা আমেজ ছড়িয়ে দিল। দূরে ভেসে চলেছে হরেক রঙের ছোট ছোট বোট। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

অহীন্দ্রনাথ বললেন, "সন্ধে পর্যন্ত থাকুন। মিনাক থিয়েটারের আজকের প্রোগ্রামটা দেখে যান। এখন চলছে 'দি অ্যাডমিরাল ক্রিশটন'। প্রতিদিন দুটো করে শো। আড়াইটেয় এবং সাড়ে আটটায়। টিকিটের দারুণ চাহিদা। আগেভাগে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। শো শুরুর দেড়ঘণ্টা আগে টিকিট দেওয়া শুরু হয়।"

আমি কেয়ারটেকার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, "কত লোকের বসবার ব্যবস্থা আছে?"

তিনি জানালেন, ১১২০টি আসন আছে। গ্যালারিতে আছে ১৬টি ধাপ। প্রতি ধাপে গড়ে ৭০টি আসন। এ ছাড়া দু'ধারে দুটি স্পেশ্যাল বক্স। বক্সের জন্যে স্পেশ্যাল ফি ও বুকিং লাগে। বড়দের জন্যে লাগে ২ পাউণ্ড ৪০ পেন্স। চোদ্দ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে ১ পাউণ্ড ৩০ পেন্স। এই বুকিং দু-তিনদিন আগে থেকেও করা যায়।

প্রথম থিয়েটারের স্মৃতি উদ্ধার করে মিঃ এডি জানালেন, রাওনা কেড থিয়েটারটি বানাবার পর লোকাল থিয়েটার গ্রুপ তাঁর কাছে অনুরোধ করলেন, তাঁরা 'দি টেম্পেস্ট' করবেন। করেও ছিলেন ওই নাটক। সাতদিন খুব হৈ হৈ করে চলেছিল নাটকটি। সেই শুরু হল মিনাক থিয়েটারের যাত্রা। এবারের 'সামার ফেস্টিভ্যাল'-এ একনাগাড়ে ১৫টি নাটকের ব্যবস্থা

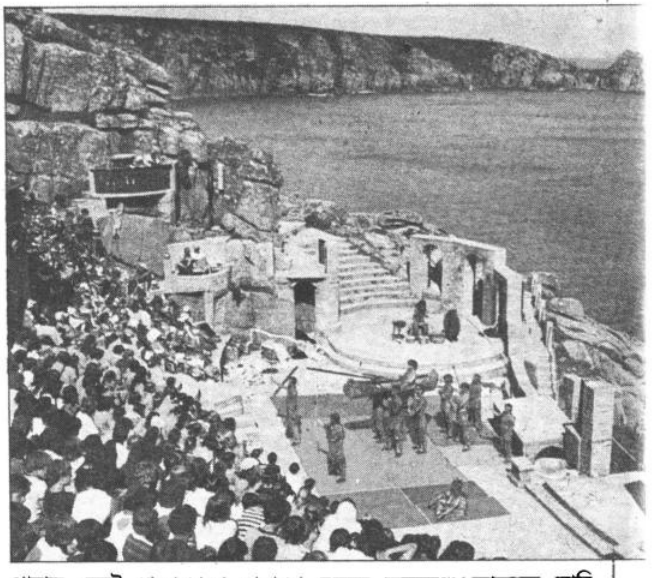

পাহাড় কেটে ধাপে-ধাপে নামানো হয়েছে মুক্তমঞ্চে আসনের সারি

হয়েছিল। '৮৫ সালের ২৫ মে থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর এই ১১০ দিন হল সামার ফেস্টিভ্যালের মরসুম। এর মধ্যে ৮০টি শো হয়েছিল।

তাঁর কথা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার প্রশংসার উত্তরে তিনি বললেন, "মিস্ রাওনা কেড সারা জীবন তাঁর সমস্ত পরিশ্রম, অর্থ, চিন্তাভাবনা দিয়ে তৈরি করেছিলেন মিনাক থিয়েটার। সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। ১৯৩২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত এতগুলো বছর তিনি একাই থিয়েটারের সবকিছু চালিয়ে গেছেন। ১৯৭৬ সালে একটি ট্রাস্ট তৈরি করে সমস্ত দায়িত্ব তিনি ওদের হাতেই দিয়ে গেছেন।"

রাওনা কেডের সারা জীবনের স্বপ্ন দিয়ে তৈরি মুক্তমঞ্চ মিনাক থিয়েটার দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। মিস্ রাওনা কেড মারা গেছেন ১৯৮৩ সালে। কিন্তু তাঁর কীর্তি চিরদিন তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। চলে আসবার আগে যখন শেষবারের মতো মিনাক থিয়েটারের দিকে তাকালাম, তখন মুক্তমঞ্চের পিছনে সমুদ্রের উদ্দাম ঢেউয়ের সঙ্গে চলেছে সূর্যের সোনালি আলোর লুকোচুরি খেলা!

সময়ের কম-বেশি

সুব্রত রায়

সূর্যের আলো তো পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। তা পৌঁছতে কত সময় লাগে বলতে পারো ? আট মিনিট।

উঁহু। হল না। চারশো বিরানব্বুই সেকেন্ড। মানে আট মিনিট বারো সেকেন্ড। বারো সেকেন্ডে আলো প্রায় সাড়ে বাইশ লাখ মাইল ছুটে যায়। সেটা বাদ দিলে হবে কেন !

মানুষের বুকে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক খুব জরুরি। থাকলে আছি। না থাকলে নেই। তাতে সময় লাগে কত ?

ঠিক এক সেকেণ্ড। অর্থাৎ দুটি মূল নার্ভের মাঝখানের অংশ বা সাইন্যাপস অতিক্রম করতে সংবেদন যে সময় নেয়, তার হাজার গুণ। সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ ফাটতেও ওই একই সময় লাগে। ০·০০১ সেকেন্ড।

রাইফেল, বুলেট, ফায়ারিং শব্দগুলো সকলেরই শোনা। বলো তো, বুলেটের মাথার ওই ক্যাপ বা ঢাকনাটা ফায়ারিংয়ের সময় ফেটে যেতে কত সময় লাগে ?

পাক্কা এক মাইক্রোসেকেন্ড। অর্থাৎ সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

ভাবছ এত কম সময় ! কথায় বলে, 'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়'। নদীর স্রোত কথাটা এখন পালটে ফেলা উচিত। এটা বিজ্ঞানের যুগ। প্রযুক্তির যুগ। প্রগতির প্রচণ্ড গতি এখন সময়কে রকেটের বেগে ছোটাচ্ছে। তাই সময়ের কয়েকশো কোটি ভাগের একভাগের দামও আজকালকার বাজারে টাকার অঙ্কে হিসেব করা যায় না।

পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে ভারী জল লাগে। বৈজ্ঞানিক নাম ডয়েটেরিয়াম। সংকেত ডি টু ও। একটা ডি টু ও দানাকে ইদানীং খুব সহজেই অন্য পদার্থের গায়ে ঝালাই দেওয়া হচ্ছে। তবে সেখানে কোনও রাংঝাল লাগছে না। শক্তিশালী লেসার রশ্মিকে এই কাজে ব্যবহার করা হয়। একই সঙ্গে তাপ ও প্রচণ্ড চাপ দিয়ে এই ডয়েটেরিয়াম-দানাকে গেঁথে দেওয়া।

সমস্ত ঘটনায় মোট সময় লাগছে এক ন্যানো সেকেন্ড। মানে সেকেন্ডের একশো কোটির এক ভাগ। ডি টু ও যখন অপেক্ষাকৃত বড় কোনও অণুর সঙ্গে জুড়ে যায়, তখন তা শক্তি বিকিরণ করে। তৈরি হয় প্রচণ্ড তাপ, যা কয়েক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসের সঙ্গে সমান। পদ্ধতিটি বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার। তবে প্রকৃতি নামক আশ্চর্য বিজ্ঞানীর কাছে কিন্তু ছেলেখেলা। কেননা, এই নিয়মেই সূর্যে তাপ তৈরি হচ্ছে। বিকিরণ হচ্ছে আলোর। পৃথিবীতে দিন ফুটছে। সেই সৃষ্টির একেবারে গোড়ার থেকে।

সময়ের মাত্রাটা আরও কমানো যায়। বিজ্ঞান এখন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। কিন্তু কমের দিকে না গিয়ে বরং উলটো পথে চলি এসো।

এবার বলো, পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটার মধ্যে সময়ের ফারাক কত ? উত্তরটা জানো নিশ্চয় ? ছ' ঘণ্টা।

পৃথিবীর নিজের অক্ষে প্রদক্ষিণ করতে কতক্ষণ লাগে ? একেবারে নিখুঁত সময় বলব ? ৮৬,১৬৪·১ সেকেন্ড। অর্থাৎ তেইশ ঘণ্টা ছাপ্পান্ন মিনিট চার দশমিক এক সেকেন্ড। বছর ঘুরতে লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড বা ৩১,৪৭২,৩২৯ সেকেন্ড।

কয়লাকে আমরা সকলেই চিনি। সেই কয়লা যা দিয়ে তৈরি, তা হল কার্বন। কার্বনের আবার প্রকারভেদ আছে। সেগুলোকে বলে আইসোটোপ। এরকমই এক আইসোটোপ সি-ফোরটিন। এটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। তেজস্ক্রিয়তার অর্থই হল সর্বদা তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করার ক্ষমতা।

তত্ত্বের দিক থেকে এই বিকিরণ ক্ষমতার আয়ুষ্কাল অনন্ত। বিজ্ঞানীরা তাই এসব পদার্থের হাফ-লাইফ বা অর্ধেক-জীবন বার করেন। যাক, আপাতত সেসব আলোচনায় যাচ্ছি না। আমাদের দরকার সময়। সি-ফোরটিনের হাফ-লাইফ হল সতেরো কোটি নব্বুই লক্ষ সেকেন্ড, বা ৫৭০০ বছর। এই সময়কে ভিত্তি করেই পুরাতত্ত্ববিদরা প্রাচীন যুগের বহু খুঁজে-পাওয়া দ্রব্যের বয়স বার করেন।

একটু আগে পৃথিবীর কথা হচ্ছিল। পৃথিবী হল সৌরজগতের সদস্য। রাজা স্বয়ং সূর্য এক মাঝারি সাইজের নক্ষত্র। এমন হাজার হাজার নক্ষত্র মিলে আমাদের ছায়াপথ। যার নাম মিলকিওয়ে। আর এই ছায়াপথের নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে ঘুরে চলেছে নক্ষত্রেরা ও তাদের নিজস্ব পরিবারবর্গ।

আমাদের সৌরজগতের এক পাক পুরো পথ চক্কর দিতে লাগে ৭,০৮০,০০০,০০০,০০০,০০০ সেকেন্ড। মানে বাইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সময়টাকে বলেন কসমিক ইয়ার। পৃথিবীর ২২৫,০০০,০০০ বছরের সমান একটি মহাজাগতিক বছর ! পৃথিবী সৃষ্টির পর বিজ্ঞানীদের হিসেবমতো এমন পুরো দশটা মহাজাগতিক বছর ঘুরে গেছে।

সময় নিয়ে এত কথার পর একটা প্রশ্ন হয়তো অনেকের মনেই উঠছে। এই ইউনিভর্স বা মহাবিশ্বের বয়স কত ? সৃষ্টির গোড়াপত্তন হয়েছিল কবে ? এর উত্তরে বলা যায়, খুব সম্প্রতি একটা হিসেব করে জানা গেছে, আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মহাজাগতিক বছর আগে মহাবিশ্বের সৃষ্টি। আর-একটু ভেঙে বলি। আমাদের পৃথিবীর হিসেবে ১০,১২৫,০০০,০০০ বছর ! অর্থাৎ ৩২০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সেকেন্ড !

সূর্যের আলো এই যে রোজ সকালে পৃথিবীতে পৌঁছয়, তাতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১২ সেকেণ্ড ; ওদিকে আবার সৌরজগতের এক পাক পুরো পথ চক্কর দিতে মোট সময় লাগে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর

শীতেরও শীত লাগে

সুদেব বকসি

শীতকালে যে শীতেরও শীত লাগে,
তাই সোয়েটার বানিয়ে দিই আগে।
দু'হাত ভরে দিই যে তাকে আরও
লেপ-কম্বল, টুপি ও মাফলারও।
পাঠাই তাকে দিঘা-গোপালপুরে ;
সুযোগ পেলে আরেকটু বা দূরে।
শীতকালে যে শীতের ভীষণ খিদে,
খিদের চেয়ে খাওয়ার নেশাই বিঁধে
রয়েছে তার জিভের আগায়, ঠোঁটে,
অনায়াসেই তাই তো মুখে ওঠে
নলেনগুড় ও জয়নগরের মোয়া,
কমলা-কপি-কড়াইশুঁটির ছোঁয়া।
শীতকালে যে শীতেরও চাই খেলা,
সকাল, দুপুর, কিংবা বিকেলবেলা
ক্রিকেট খেলে এবং ভলি, খো-খো,
উঠবে না সে, যতই তাকে বকো।
শীতকালে যে শীতেরও শীত লাগে,
কিন্তু সে তো ওঠে সবার আগে।
নয় সে কুঁড়ে, হয় না কাজে ভুল,
ফোটায় গাছে হরেক গাঁদাফুল।

ছবি : দেবাশিস দেব

অথচ দুঃখ

প্রভাকর মাঝি

বড় বড় মানুষের ত্যাগ বড় বড়,
লোকমুখে শোনো, নয় ইতিহাসে পড়ো।
আরও ত্যাগ আছে চুপ চিরদিন ধরে,
কাগজে বেরোয় না তা হৈহৈ করে।
আসলে এটাই রীতি এই দুনিয়ায়,
গেঁয়ো যোগীদের গাঁয়ে ভিখ মেলা দায়!
বলতে নিজের কথা সঙ্কোচ পাই,
তুমি যেন শ্লাঘা ভেবে নিয়ো না, দোহাই।
অ্যানুয়ালে অতি সোজা অঙ্ক সকল
ইচ্ছে করেই ভুল করলাম, ফল
হাতেনাতে, হারাধন হল তো প্রথম,
তবে বলো, এই ত্যাগ কার চেয়ে কম ?
অথচ দুঃখ, কেউ বুঝল না আর—
না অঙ্ক স্যার, না বা ঝানু রিপোর্টার।

হারুদা, ফিরে এসো, আমার ভয় করছে

হারু গেল হারিয়ে

বিজনকুমার ঘোষ

বিকাশবাবুর মনে খুব দুঃখ। অখ্যাত মুচকুন্দপুর স্টেশনে পড়ে রয়েছেন, তাই এই অবস্থা। হারুর এত বুদ্ধি, ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা, দেশপ্রেম—সব বৃথা গেল। কেউ জানতেই পারছে না যে মাতলা নদীর একটা সাধারণ কুমিরের মধ্যে এত গুণ থাকতে পারে! প্রচারের অভাবেই তো।

অথচ— অথচ ওড়িশার সিমলিপালের খৈরি নামে এক বাঘকে নিয়ে কত মাতামাতি! কাগজে কাগজে খৈরি, খৈরির পালক-পিতার ছবি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। এক বিখ্যাত কবি খৈরিকে নিয়ে কবিতা লিখলেন। এমনকী, ওর ওপর বই পর্যন্ত বেরিয়ে গেল! তা হলে আমার হারু কী দোষ করল?

ঠিক এই সময় বরানগরের টবিন রোড থেকে শ্রীমান কৌশিকের চিঠি এল।

শ্রীচরণেষু পিসেমশাই, মনে একদম দুঃখ রাখবেন না। বকুলদির বিয়েটা ভালভাবেই হয়ে গেছে। তবে হারুকে না দেখতে পেয়ে সবাই হতাশ। কী আর করা যাবে! ভবিষ্যতে কোনও সুযোগ পেলে ওকে এখানে আনার চেষ্টা করব। অবশ্যই নতুন পন্থায়, যাতে ওর মাথা না বিগড়ে যায়।

আগের কথায় ফিরে যাই। হারুর কলকাতা দর্শন সুখের না হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই ও কিন্তু দারুণ হৈচৈ ফেলে দেয়। কলকাতার ইংরেজি, বাংলা সব কাগজেই আমাদের অতিপ্রিয় হারুর খবর বেরিয়েছে। হয়তো তোমার তা নজরে আসেনি। তাই আমি মাত্র দুটি পত্রিকার কাটিং পাঠাচ্ছি।

'দৈনিক কোলাহল' পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে লেখা হয়েছে : মঙ্গলময়ের কোনও শুভ ইচ্ছাই কি এই অদ্ভুত-দর্শন জীবের মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে? আমাদের প্রশ্ন ইহাই। কেননা, মুখ্যমন্ত্রী হইতে পুলিশ কমিশনার, ট্রাফিক-পুলিশের উলটাপালটা কাজ বন্ধ করিতে কখনও নরম, কখনও গরম, কখনও বা গলাখাঁকারি দিয়া কতভাবেই না উপদেশ বর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু সবই যেন ভস্মে ঘি ঢালা! পুলিশ-লরিওয়ালা সম্পর্ক সেই আদায়-কাঁচকলায় রহিয়া গিয়াছে। সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের কালো হাতে দুই-দুইবার দাঁতের চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া মঙ্গলময় এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, ওরে আমি আছি, আর ভয় নাই। এইভাবে নির্যাতিত মানবাত্মাকে (এ-স্থলে লরিওয়ালা) বরাভয় দিতে যুগে-যুগে মর্তধামে (এ-স্থলে কলিকাতায়) নানারূপে

বুস্ট

সারাদিন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার জন্য সুস্বাদু শক্তিদায়ী পানীয়

আপনার সন্তানটি আজকের এই ধাবমান অগ্রগতির যুগের এক বাড়ন্ত সন্তান।

আজকের এই জটিল ইলেকট্রনিক যুগের সব খেলাই তার জীবনে এক চ্যালেঞ্জ। তার আগ্রহী এবং কৌতুহলী মন এই জটিলতাকে জানবার জন্য সে অনেক বেশী পড়াশুনো করে, অনেক বেশী পরিশ্রম করে-আনন্দ পায়। স্কুলে, টেনিস কোর্টে অথবা যে কোন নতুন খেলাতেই সে পরিশ্রম করতে আগ্রহী কারণ সে সর্বত্রই সর্বাগ্রে থাকতে চায়।

সত্যিই, আপনার সন্তানের আজ এক ক্ষিপ্র, গতিশীল জীবন, এক তীব্রগামী ট্রেনের মতই দুর্বার গতিতে তার দিনগুলি এগিয়ে চলেছে।

বুস্ট – এক চকলেটের স্বাদে সুস্বাদু শক্তিদাতা

এই স্ফূর্তি ভরা প্রাণচঞ্চল কর্মকাণ্ডে আপনার সন্তানের প্রচুর শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। সুতরাং তার দিনগুলি এক নির্ভরযোগ্য শক্তিদায়ী পানীয় দিয়ে শুরু করাই সর্বোত্তম উপায়।

বুস্ট, ঘন দুধ, সোনালী দানার গম, মল্টেড বার্লি এবং কোকোর মতন শক্তিবর্দ্ধক উপাদানে তৈরী একটি সুস্বাদু পানীয়।

বুস্ট দুধে মিশিয়ে খেতে চমৎকার। সারাদিনের এই প্রাণচঞ্চল কর্মকাণ্ডের জন্য সজীব ও প্রাণবন্ত রাখতে সকালের জল খাবারের সঙ্গে বুস্ট একটি আদর্শ পানীয়।

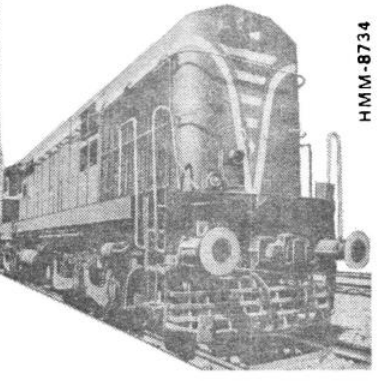

HMM-8734

বুস্ট

প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

আমার আবির্ভাব ঘটে !

অতএব আমাদের প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে। আমরাও মঙ্গলময়ের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে চাই, ওরে আর ভয় নাই !

বহুল প্রচারিত 'সাপ্তাহিক সর্ষেফুল' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেন : মাঝে-মাঝে চিরচেনা কলকাতা শহর রহস্যে ভর করে পলকে অচেনা হয়ে যায়। তখন কোথায় বা থাকে ফুটপাথের জবরদখল দোকান, চলমান ট্রাম, কোথায় বা প্রিয় দলের পরাজয়ে ময়দান-ফেরত জনতার বিষাদ-স্রোত ! তখন সবকিছুই রহস্যের দোলায় দুলে উঠে অচেনা রঙ ছড়াতে থাকে। বলতে দ্বিধা নেই, স্টাফ রিপোর্টারের জীবনে এইরকম মুহূর্ত খুব কমই মেলে।

সাত জুন বেলা তিনটেয় আমাদের অফিসে টেলিফোন বেজে উঠল, ক্রিং ক্রিং। ওপাশ থেকে জনৈক বিশিষ্ট নাগরিকের আর্তকণ্ঠ : শিগগির চলে আসুন এন্টালির মোড়ে। মোটর গাড়ির ভিতর এক অদ্ভুত-দর্শন জীবের আবির্ভাব। অনেকটা কুমিরের মতো দেখতে। উঃ, দাঁতে কী জোর মশাই ! সর্বশক্তিমান পুলিশ পর্যন্ত ছটফট করছে। দেখলে চোখ ফেটে জল আসে। ব্রিটিশ আমল থেকে কলকাতায় আছি, কিন্তু এই রকম অদ্ভুত দৃশ্য কখনও দেখিনি। মোটর গাড়িটা এইমাত্র সুরেশ সরকার রোড দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে গেল। জনতা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আর বলতে পারছি না—

কাট !

খবরের উৎস এটুকুই। বলা বাহুল্য, আমার সাংবাদিকের রক্ত নেচেকুঁদে উঠল। তক্ষুনি সম্পাদকের আশীর্বাদ পকেটে গুঁজে বেরিয়ে পড়ি। ড্রাইভারের নাম তুরন্ত সিং। অতিশয় পাকা হাত, এক মিনিটের মধ্যেই এন্টালির মোড়। সত্যি লণ্ডভণ্ড কাণ্ড সেখানে ! জনতা আতঙ্কগ্রস্ত। অ্যাম্বুলেন্স এসে আহত পুলিশকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী আমরা গাড়ির মুখটা দক্ষিণে ঘুরিয়ে দিলাম। অনেকেই জানালেন, গাড়িটা বালিগঞ্জের দিকে ছুটে গেছে। গড়িয়াহাটার মোড়েও ঠিক একই ঘটনা। এখানে দাঁত গভীর হয়ে বসে। তাই পথচারীদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপও গভীরতর। প্রকাশ, অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে তিনজন মূর্ছা যান। দোকানপাট দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়। দেখতে-দেখতে বিশাল এলাকা জুড়ে যানবাহন অচল হয়ে পড়ে। দৌড়তে গিয়ে পাঁচজনের পা ভাঙে। ঢাকনাহীন ম্যানহোলের মধ্যে পড়ে যায় তিনজন। আতঙ্ক যেন সংক্রামক ব্যাধি ! অনেকেই জানে না ব্যাপারটা কী, তবু ছুটতে থাকে।

ভাগ্য ভাল, এক লহমার জন্যে সেই মোটর গাড়িটা নজরে আসে। চালকের বয়েস খুবই অল্প, কিন্তু তুরন্ত সিংকে গাড়ি চালানো শেখাতে পারে। কেননা, যে গলিতে রিকশার চলতে কষ্ট হয়, সেখানে গাড়িটা ওই ছোকরা অনায়াসে ঢুকিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। পুলিশের গাড়ি এখানে এসে মার খায়। পেছনের সিটে দুটি ছেলে এবং একটি কচি মেয়েকে দেখা গেল। হ্যাঁ, ড্রাইভারের পাশেও আর একজন ছিল কালোপানা। কিন্তু অদ্ভুত-দর্শন জীবটি কোথায় ? এত বড় কাণ্ডের নায়ক কী কর্পূরের মতো উবে গেল ?

হাসপাতাল সূত্রের খবর : পুলিশদ্বয়ের অবস্থা ক্রমশ উন্নতির পথে। মেডিক্যাল বুলেটিনে বলা হয়, হাতে করাতের মতো সারি-সারি দাঁতের চিহ্ন। তবে বিষের পরিমাণ খুবই কম। কুমির-জাতীয় জলচর প্রাণীর হঠাৎ আক্রমণ বলেই মনে হয়।

তবে এতে অন্তত একটা উপকার হয়েছে, পুলিশ ও লরিওয়ালাদের মধ্যে আগের সেই বৈরী ভাব আর নেই। বরং 'তবিয়ত আচ্ছা হ্যায় তো', 'কাঁহা যানা হ্যায় ভাইয়া' —ইত্যাকার কুশল প্রশ্ন বিনিময় করতেও নাকি শোনা যাচ্ছে আজকাল।

আমাদের প্রশ্ন, ক্ষণিকের অতিথি শহরে যে উপকারটা করে দিয়ে গেল সেটা কত দিন বজায় থাকবে ? বলা বাহুল্য, উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে !

চিঠি এবং পত্রিকার কাটিং পড়ে তো বিকাশবাবুর আনন্দ আর ধরে না ! বারবার জোরে-জোরে পড়তে লাগলেন সবাইকে শুনিয়ে। নটুর মা রোজের দুধ দিতে এসেছিল, তাকেও ধরে শুনিয়ে দিলেন। বাসন মাজার ঠিকে ঝি সুশীলাও বাদ গেল না। মুচকুন্দপুরের হিরো তখন রেলের পুকুরে আপন মনে সাঁতার কাটছিল। কান্ত ডেকে নিয়ে এল। বিকাশবাবু তার সামনেও চিৎকার করে পড়া শুরু করে দিলেন।

যেন কতই বুঝতে পারছে, এমন ভঙ্গিতে হারুর মাথা নাড়া দেখেই তিন ভাই-বোন চেঁচিয়ে উঠল, "ওমা, দেখে যাও, দেখে যাও।"

মা রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে ব্যাপার দেখে গর্বে হেসে উঠলেন, "সত্যিই তো, কঠিন লেখাও ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে। আমার হারুর কত বুদ্ধি !"

বিকাশবাবু বললেন, "কৌশিকের জন্যেই হারুর এত নামযশ ! পাড়াগাঁয়ে থাকি, সব সময় নজরে আসে না, তাই কাগজের কাটিং পর্যন্ত পাঠিয়ে দিল। নাঃ, ছেলেটা জীবনে উন্নতি করবে, দেখে নিও।"

তক্ষুনি সাইকেল চালিয়ে শান্ত দুই মাইল দূরের হলধরকাকাকে খবর দিয়ে এল। হলধরকাকার পুরনো আমলের একটা ক্যামেরা আছে। গ্রামে বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধে অর্ডার পেলে ছবিটবি তুলে দেন।

তো, ভরদুপুরে বিরাট ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে, তেপায়া হাতে হলধরকাকা এসে হাজির। বিকাশবাবু হারুকে কোলে নিয়ে পুকুরপাড়ে পরপর অনেকগুলি ছবি তুললেন। শান্ত, কান্ত, খুকুর মাথায় চড়ে হারু দারুণ একখানা পোজ দিল ! ক্যামেরায় ক্লিক্।

মা'র কপালটা খারাপ। হারুকে কোলে নিতেই বিরাট সাইজের এক বেআক্কেলে মেঘ আকাশের রাজাকে কম্বল চাপা দিল। তার মানে এখন আর ফোটো তোলা যাবে না। এই সুযোগে মা হারুকে সাজাতে বসলেন। মুখে স্নো-পাউডার আর লম্বা কপালে লাল টিপ—হারুকে আর চেনাই যাচ্ছে না। তাঁর যুক্তি, পয়সা খরচ করে যখন ফোটো তোলা হচ্ছে তখন ও কেন সাজবে না ?

খুকু এই সময় ড্রয়ার থেকে সেন্টের শিশি আনতে হাসির ধুম পড়ে গেল। বোকা মেয়ে !

মেঘের কোলে ফের রুপোলি ঝিলিক। হারুকে নিয়ে আর একদফা কাড়াকাড়ি। গ্রামে এই সময় কোনও বিয়ে, শ্রাদ্ধ পৈতে নেই। যাক, হারুর কল্যাণে হলধরকাকার টু-পাইস

ইনকাম হল !

সেদিন দুপুরে স্টেশনের অফিসঘরে বসে কাজ করছিলেন বিকাশবাবু। হঠাৎ মনে হল পায়ের ওপর আরশোলা চলাফেরা করছে। তাকিয়ে দেখেন আরশোলা নয়, রেলের বিরাট টেবিলের তলায় একটি মানুষ ঢুকেছে প্রণাম করতে। চেঁচিয়ে ওঠেন, "কে ওখানে, কে ?"

"আমি কাকাবাবু।" বছর-চল্লিশের একটা লোক উঠে দাঁড়াল।

"ও সুযোগ। তা কী মনে করে ?" ক্যানিংয়ের মানুষকে হঠাৎ মুচকুন্দপুরে দেখতে পেয়ে খুশি হন বিকাশবাবু।

"আপনার কাছেই এসেছিলাম কাকাবাবু। বিশেষ দরকার।"

"বেশ তো, বলে ফ্যাল।" তারাপদকে ডেকে দু'কাপ চায়ের অর্ডার দেন।

চা-বিস্কুট খেয়ে এ-কথা সে-কথার পর শেষে মনের কথাটা বেরিয়ে আসে।

সুযোগের আসল নাম গোবর্ধন পুরকায়েত। সেকেলে এই নামটা ওর একদম অপছন্দ। কিন্তু বাবার ভয়ে বিশেষ কিছু করা যায়নি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর পয়লা সুযোগে বারুইপুর কোর্টে এফিডেবিট করে নাম পালটে হয় সুযোগসন্ধানী পুরকায়েত। নামটি অর্থবহ এবং অনুপ্রাসও আছে। ক্যানিংয়ের লোকেরা ডাকে সুযোগদা বলে। বাবার মৃত্যুর পর অল্প বয়সেই সুযোগ দক্ষিণবঙ্গের অনেকগুলি ভেড়ির মালিক হয়ে বসে। ওর একটাই নেশা বা হবি, তা হল দেশের সেবা করা। দেশসেবা করতে পারলে আর কিছু চায় না। ভারতের হেন দল নেই যে, সুযোগ তাতে যোগ দেয়নি। দুঃখের বিষয় যখনই যে দলের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছে তখনই হেরে ভূত হয়ে গেছে। কতবার জামানত জব্দ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অকৃতজ্ঞ দেশের লোকের ওপর ঘেন্না ধরে যায় সুযোগের।

অথচ ফি-বার ভোটের সময় সুযোগের শিবিরই বেশি জমজমাট। হৈ-হট্টগোল, লোকজনের ভিড় দেখে মনে হয় এবার সুযোগকে কেউ রুখতে পারবে না। ছেলে-ছোকরারা রিকশায় মাইক লাগিয়ে চেঁচাতে থাকে, "সুযোগদাকে সুযোগ দিন, নিজের ভাল বুঝে নিন।"

গলা শুকিয়ে গেলে গলা ভেজাবার ব্যবস্থাও ভাল। এলাকার সমস্ত খাবারের দোকানে সুযোগদার ঢালাও নির্দেশ, বিল আমি মেটাব, তোমরা রুচি অনুযায়ী খাবার সাপ্লাই দিয়ে যাবে। এক-একটা ভোট আসে আর চপ, কাটলেট, ডিমের ডেভিল, রসগোল্লা, সন্দেশ খেয়ে-খেয়ে সাপোর্টারদের চেহারা যায় ফিরে। তাতে সুযোগদার একটুও দুঃখ নেই। বলে, "আহা, দেশেরই তো লোক, খাক ওরা।"

তবে, আগে ছিল ছ'টা ভেড়ি, এখন কমতে-কমতে তিনটিতে এসে ঠেকেছে, এই যা।

বিকাশবাবুকে সুযোগ খুব মান্যগণ্য করে। কাকাবাবু ডাকে। ছেলেটাকে দেখে দুঃখ হয়। একবার ভোট চাইতে এলে বিকাশবাবু ওকে ঘরে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "হ্যাঁ রে, বাপের সম্পত্তি এইভাবে উড়িয়ে দিবি ? এ যে চোখে দেখা যায় না !"

রেগে উঠে সুযোগ বলেছিল, "কাকাবাবু, আপনি এসব বুঝবেন না, আমি দেশসেবা ভালবাসি। এ জন্য ভিখিরি হয়ে গেলেও কুছ পরোয়া নেই।"

কাকাবাবুর যুক্তি, "এম·পি-এম·এল·এ· হয়েই যে দেশসেবা করতে হবে, তার কি কোনও মানে আছে রে ? রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার—এঁরাও তো দেশসেবা করেছিলেন। কিন্তু কেউ-ই তো এম·পি· বা এম·এল·এ· ছিলেন না ! তা হলে ?"

"সেকালে একালে অনেক তফাত। আমি চলি কাকাবাবু। এখনও সাতটা সভায় ভাষণ দিতে হবে। লোকজন আমার জন্যে ওয়েট করছে।"

প্রথম-প্রথম মনে হয়, সুযোগ বুঝি এবার সবাইকে কচুকাটা করে দেবে। কিন্তু যখনই ভোট গোনা হতে থাকে তখনই বিপর্যয় ঘটে ! সুযোগ আর বাড়ির বাইরে বের হয় না। বেকার সাপোর্টাররা এসে নানাভাবে মন চাঙ্গা করার চেষ্টা করে। বলে, "দেশের লোক তোমাকে এখনও চিনতে পারেনি সুযোগদা। কোনওরকমে একবার চেনাতে পারলেই ধামাভর্তি ভোট দিয়ে যাবে !"

ভোটযুদ্ধে সুযোগের প্রধান পরামর্শদাতা এবং দক্ষিণহস্ত সর্পিল সাঁপুই সান্ত্বনা দেয়, "একদম হতাশ হবে না। ঠিক আছে, সামনেই জেলা পরিষদের নির্বাচন, নেমে পড়ো। হোক না ছোটখাটো ব্যাপার। তবে এও বলে রাখছি সুযোগদা, তোমাকে দিল্লি না পাঠাতে পারলে আমি ফের নাম পালটে ফেলব।"

তা কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর শোনা যায়, সুযোগ নাকি দল বদল করেছে। সাবেক দলটি যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিল না। আর নতুন দলের প্রধান লক্ষ্যই হল, দেশে কোনও গরিব না রাখা। ক্ষমতায় এলে সবাইকে বড়লোক করে দেবে।

প্রথমে কানাঘুষো পর্যায়ে থাকে, পরে প্রকাশ্যে প্রচারের দৌলতে সন্দেহ নিরসন হয়। মাইক বাঁধা সাইকেল-রিকশায় বসে সমর্থকরা চেঁচাতে থাকে, "সুযোগদার দলবদল, দেশের হবে সুমঙ্গল—"

এই দলবদল উপলক্ষে একদিন গণভোজ দেওয়া হয়। গণভোজের আইটেম মুরগির মাংস, বিরিয়ানি, মোল্লাখালির দই আর মোল্লাহাটির ক্ষীরমোহন। এ ছাড়া, ভেড়ির মাছ তো আছেই। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সুযোগদা বেশি বিলাসিতা পছন্দ করেন না। ভারত গরিব দেশ, সেভাবেই চলতে হবে। সুযোগদার সাফ কথা, 'এতে যাদের পোষাবে তারা খাবে, না পোষাবে তো চলে যাও। কুছ পরোয়া নেই।'

এখন খবরের কাগজে-কাগজে অদ্ভুতদর্শন জীবের খবর পড়ে সর্পিল সাঁপুইয়ের মনে ঝিলিক খেলে যায়। তখন থেকেই খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়। জীবটা নাকি কুমিরের মতো দেখতে, মাত্র এটুকু সম্বল করে অবশেষে হদিস বেরিয়ে পড়ে। আরে, এ তো খোদ মাতলা নদীরই সুসন্তান ! ক্যানিংয়ের গৌরব ! আর সামনেই জেলা পরিষদের নির্বাচন। এমন সুযোগ কেউ কখনও হাতছাড়া করে ?

মুচকুন্দপুরে সুযোগসন্ধানী পুরকায়েতের আগমনের হেতু এটাই। ক্যানিংয়ে হারুকে নিয়ে গিয়ে সে গণসম্বর্ধনা দিতে চায়। এতে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বলেই তার বিশ্বাস। হাটের লোক ভেঙে জড়ো হবে। সেই সভার প্রধান বক্তা সুযোগ এবং সভাপতি হবেন বিকাশবাবু।

এই সভাপতির কথায় বিকাশবাবু একটু কাহিল হয়ে পড়েন। ক্যানিংয়ে থাকতে সভাপতির পদটি ছিল তাঁর বাঁধা। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী, সংস্কৃতি পরিষদ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সবেতেই তাঁর ডাক পড়ত। ক্যানিংয়ে তাঁর মতো এমন গণ্যমান্য আর কে ছিলেন ? ফুলের মালা গলায় চেয়ার আলো করে বসতেন বিকাশবাবু। মাইকে গলাখানা গমগম করত। হায়, মুচকুন্দপুরে সে-সব পাট উঠে গেছে। এখানে কে-ই বা চেনে তাঁকে, কে-ই বা খাতির করে ? বললেন, "বাবা সুযোগ, তোমার এলেম আছে বটে ! জীবনে উন্নতি করবেই, সে আমি ক্যানিংয়ে থাকতেই বুঝতে পেরেছি। তবে একটা মুশকিল—"

"কী মুশকিল, কাকাবাবু ?"

"আরে, আমার এক শালির ছেলে এসে হাজির। ওর বোনের বিয়েতে হারুকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। ছোকরা নাছোড়বান্দা। তারপর খবরের কাগজে তো সব কিছু পড়েছ। সেজন্যে তোমার কাকিমা হারুকে আর চোখের আড়াল করতে চায় না।"

"সে আমি বুঝব।" হাসি-হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল সুযোগ।

"কী রেজাল্ট হয় জানিয়ে যেও বাবা। সভাপতি হলে গরদের পাঞ্জাবিটা তো কাচাতে হবে।"

"আচ্ছা" বলে বেরিয়ে গেল সুযোগ।

স্টেশনের পাশে সারি-সারি দোকান। মুচকুন্দপুরের মুচমুচে নিমকি বিখ্যাত। তিন টাকার নিমকি আর দশ টাকার রসগোল্লা কিনে সুযোগ গেল কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে। আর আধ ঘণ্টা পরেই ফিরে এল হাসিখানা মুখে ঝুলিয়ে।

"কাকাবাবু, কেল্লা ফতে।"

"তাই নাকি ? আমি জানি তুই পারবি। কিন্তু হারুকে নিবি কীভাবে ?"

"আগামী রবিবার সকাল দশ ঘটিকায় সভা। আপনার জন্যে মোটরগাড়ি আসবে। আর হারুকে কীভাবে নেব, সে এখন বলব না," গলার স্বর খাটো করল সুযোগ, "রাজনীতি করার এই এক জ্বালা কাকাবাবু, রিপোর্টাররা চারপাশে ঘুরঘুর করে।"

সুযোগের যে কথা সে-ই কাজ। না হলে এত উন্নতি করতে পারে কখনও ! গরদের পাঞ্জাবি, শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি পরে মোটরগাড়িতে ভূমিকম্প লাগিয়ে বিকাশবাবু তো বসলেন। অফিস অ্যাসিসট্যান্ট সদাসুখ কুণ্ডু এ বেলার কাজটা চালিয়ে নেবেন। হারু যাচ্ছে, আর তিন ভাই-বোন কি ঘরে বসে থাকতে পারে ? অতএব ওরাও মোটরে উঠল। মা গেলেন না। তবে সাবধান করে দিলেন, "হারু যা দুরন্ত, ওর দিকে নজর রেখো বাবা সুযোগ।"

"সে বলতে হবে না কাকিমা।"

এবার যেভাবে হারুকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হতেই পারে না। একটা টেম্পোর মধ্যে হাতখানেক জল। সেই জলে পাঁচ কিলো তাজা চারাপোনা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হারু সেগুলো দাঁতে কাটতে-কাটতে ক্যানিং যাবে। আর যদি গরম লেগে যায় সেজন্যে কাঠের গুঁড়োর মধ্যে বরফের একটা চাঁই সঙ্গে রাখা হয়েছে।

না, পথে কোনও গণ্ডগোল হল না। অল্প সময়ের মধ্যে

মসৃণ গতিতে একেবারে ক্যানিং। সাত নম্বর দিঘির পারের মাঠে লোকে লোকারণ্য। নদী পেরিয়ে নৌকো, লঞ্চে চড়ে লোক এসেছে। বাসন্তী, গোসাবা, ঝড়খালি, ছোট মোল্লাখালি, বড় মোল্লাখালি থেকে পর্যন্ত কাতারে-কাতারে মানুষ এসেছে হারুর সম্বর্ধনা দেখতে। এলাহি ব্যাপার ! চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না। কী করেছে সুযোগ আর তার সহযোগী সর্পিল !

যেন মেলা বসে গেছে। পান-বিড়ির দোকান। তেলেভাজা, চিড়ে-মুড়ির দোকান, মনোহারি—কিছুই বাদ যায়নি। হোটেলের লোকজন পর্যন্ত এসে যাকে-তাকে ধরছে, "ও চাচা, ও কাকা, গরমাগরম ডাল-ভাত, মাছের ঝোল খেয়ে নাও টপ করে, সস্তা রেট।"

এদিকে পর-পর খাট পেতে মঞ্চ বানানো হয়েছে। তার ওপর টেবিল। টেবিলে লতাপাতা-আঁকা সাদা চাদর। দু'পাশে সভাপতি ও প্রধান বক্তার গদি-আঁটা চেয়ার। মাথার ওপর শামিয়ানা। মোটর ও টেম্পো এসে পৌঁছতেই সুযোগ, সর্পিল এবং স্বেচ্ছাসেবকরা অত্যন্ত সমাদরে বিশিষ্ট অতিথিদের মঞ্চে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে এক ছোকরা স্লোগান দিতে আরম্ভ করেছে, "হারাধন কি জয়, সুযোগদাকে সুযোগ দিন।"

সর্বনাশ ! বিকাশবাবু তাড়াতাড়ি মাইকটা টেনে নিলেন, "বন্ধুগণ, চিৎকার-চেঁচামেচি একদম নয়। হারু ভয় পেয়ে যেতে পারে। ও একসঙ্গে এত লোক কখনও দেখেনি। আপনারা শান্ত হয়ে বসুন। আগে আসবার জন্যে হুড়োহুড়ি করবেন না। হারুকে টেবিলে তোলা হয়েছে, যাতে আপনারা ভালভাবে দেখতে পান। একদম চুপ বন্ধুগণ, নো হাততালি।"

যাক, সভাপতির কথায় কাজ হল। এবার সভাপতি বরণ। ফুটফুটে একটি মেয়ে এসে গাঁদাফুলের মালা পরিয়ে দিল। আজকাল এক ফ্যাশান হয়েছে, সভাপতিকে মালা দেওয়া মাত্রই সেটি খুকুর গলায় পরিয়ে দেওয়া ! তা কেন ? বিকাশবাবু বরাবর সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মালা গলায় দিয়ে বসে থাকেন। মালা পরেই বক্তৃতা দেন। সভাপতি বলে কথা !

এদিকে একটা মুশকিল বেধে গেল। খুকু কিছুতেই হারুর গলায় মালা দিতে রাজি হচ্ছে না। সুযোগের কোলে চড়েও

সস্তা পাউডারগুলো ন্যাটের মত পরিস্কার তো করেই না, ভালো জামাকাপড় নষ্ট করে

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হাল্কা অথচ ময়লা ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অ্যাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। ফলে জামাকাপড় নষ্ট হয় না কাপড়কাচা হাতও যত্নে থাকে। সাধে কি বলি—
এতটুকু ন্যাটের ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

A Kusum Product | আস্থার সঙ্গে কিনুন

GK&E.C85.43

না। হারু কিন্তু কোনও দুষ্টুমি করছে না। চুপচাপ টেবিলের ওপর শুয়ে আছে। লেজটা আলতো পেতে রেখেছে। তবু অকারণ ভয়। শেষে হেসে সভাপতিকেই হারুর গলায় মালাটা পরিয়ে দিতে হল। হারু চোখ দিয়ে একটু হাসল। সে হাসি চিনতে পারেন এক বিকাশবাবুই। হ্যাঁ, শান্ত, কান্ত, খুকুও পারে।

সভা প্রায় এক ঘণ্টা লেট। প্রধান বক্তার আর সবুর সইছে না। কিছুদিন বাদেই জেলা পরিষদের নির্বাচন। হাজার-হাজার ভোটার সামনে। সুতরাং গলাকাঁপানো, দরদমাখানো বক্তৃতা চলছে : সভাপতি, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী এবং মা-বোনেরা ও কচিকাঁচারা, আজ ক্যানিংবাসীর পক্ষে মহা সুখের দিন। ঐতিহাসিক দিনও বলা যায়। কেননা, যিনি আমার সামনে টেবিলে শুয়ে আছেন তিনি আমাদের এই মাতলা নদীরই সুসন্তান, ক্যানিংয়ের গৌরব ! এই গৌরব বক্ষে ধারণ করে আজ আমরা সত্যিই গর্বিত।

সুযোগ প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে এই কথাগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে গেল। থামার কোনও লক্ষণ নেই। আরও কতক্ষণ চলবে কে জানে ! পর পর অনেকগুলি হাই ছাড়লেন বিকাশবাবু। উদ্দেশ্যমূলক গলাখাঁকারিও দিলেন। কিন্তু উৎসাহে ভাটার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে শামিয়ানা উড়ছে পতপত করে। সামনে বাঁধের ওপাশে মাতলা নদী রোদ লেগে ঝিকমিক করছে। কিন্তু হায়, সুযোগ ফের কোমর দুলিয়ে হাত মুঠো করে বলে চলেছে : বন্ধুগণ, আপনারা জানেন হারাধন, ওরফে আমাদের অতি প্রিয় হারু সেদিন মাত্র দু-ঘণ্টার জন্যে কলকাতা গিয়েছিল। কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর অষ্টম নগরীতে হারু তুলকালাম কাণ্ড করে বসে। সত্যি ও কুমির নয়, দেবদূত। হারুর জীবনের প্রধান কীর্তি, পুলিশের চরিত্র-সংশোধন ! বন্ধুগণ, ছেলেবেলাটা যার এত বৈচিত্র্যময়, বড় হলে সে না জানি আরও কতভাবে দেশের সেবা করবে। ভাবতেও মন ব্যাকুল হয়, শরীর রোমাঞ্চিত—

আবার কুড়ি মিনিট। আবার গলাখাঁকারি ! মুশকিল হয়েছে, বিকাশবাবু যা-যা বলবেন ভেবেছিলেন, তার প্রায় সবগুলিই সুযোগ বলে ফেলল। তা হলে সভাপতির জন্যে কী রইল ? আর এটাও ঠিক, কেউ এসব ছাইভস্ম বক্তৃতা শুনতে আসেনি। লোকে হারুকে দেখবে, ওর জীবনকাহিনী জানতে চায়। সোনার জলে হারুর নাম লেখা একটা মেডেল প্রেজেন্ট করা হবে। কত কাজ বাকি ! বিরক্ত হয়ে বিকাশবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "চুপ, চুপ।"

সামনে অনেকক্ষণ ধরে কতগুলি ছেলে বসার জায়গা নিয়ে গণ্ডগোল করছিল। সুযোগ ভাবল, সভাপতি বোধ হয় ওদের চুপ করতে বলছেন, যাতে বক্তৃতাটা সবাই শুনতে পায়। সে অমনি দ্বিগুণ উৎসাহে আবার বলতে লাগল : বন্ধুগণ—

হারুর গলার কাছটা যে নরম, এটা হয়তো অনেকেই জানে না। এখন গাঁদাফুলের মালা থেকে একটা বিষপিঁপড়ে বেরিয়ে সেই নরম জায়গায় কুটুস-কুটুস আরম্ভ করে দিয়েছে। তা ছাড়া, এ সব ব্যাপার-স্যাপার অনেকক্ষণ থেকে হারুর মোটেই ভাল লাগছিল না। প্রবল আবেগে সুযোগ যেই হাতের মুঠোটা মুখের কাছে এনেছে, অমনি তাতে এক মোক্ষম কামড়। হাঁউ-মাঁউ করে উঠতে গিয়ে ধাক্কা লেগে টেবিল উলটে পড়ল। আর হারুও ছিটকে পড়ল সামনে-বসা ছেলেছোকরাদের মধ্যে। অমনি 'ওরে বাবা রে, মা রে, খেয়ে ফেল্লে রে' বলে চিৎকার। যে যেদিকে পারল দৌড়তে লাগল। ভিড়ের চাপে মুড়ি-চিড়ে, পান-বিড়ির দোকান ছিটকে গেল। হারুর পিঠে একটা বাঁশ পড়তে বেচারা ভয় পেয়ে দিঘির পাড় ধরে দৌড়তে শুরু করল। তারপর দৌড়তে-দৌড়তে মাতলা নদীতে। অর্থাৎ যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল।

হায় হায় করে উঠলেন বিকাশবাবু ! হারুর পেছন-পেছন তিনিও ছুটে এসেছিলেন। একটুর জন্যে ধরতে পারলেন না। শান্ত, কান্ত কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু মনের জোর বটে খুকুর ! নদীর দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে ডাকতে থাকে, "হারুদা, ও হারুদা, ফিরে এসো, আমার ভয় করছে।"

কান্নাকাটি দেখে আবার কিছু লোক সেখানে ভিড় জমাল। রুমালে চোখ মুছে বিকাশবাবু বলতে লাগলেন, "হারু আমার নিজের ছেলের মতো। এখন কী করে বাড়িতে মুখ দেখাব।"

এক বৃদ্ধ চাচা সান্ত্বনা দিল, "বাবুগো, আর কেঁদোনি, কোলের ছেলে আবার কোলেই ফিরে আসবে।"

"আর এসেছে ! হারু বড় অভিমানী। সভাপতি হওয়াই আমার কাল হল।"

এই বিপদের সময় দুই উদ্যোক্তাই বেপাত্তা। একজন বলল, "সুযোগসন্ধানী পুরকায়েতকে কলকাতার ট্রেনে উঠতে দেখা গেছে, সর্পিল সাঁপুইকে বাসে।" আর একজন তার প্রতিবাদ জানাল, "সর্পিলই ট্রেনে এবং সুযোগসন্ধানী বাসে উঠে এতক্ষণে তালদি।"

মোদ্দা কথা, দু'জনেই হাওয়া !

মোটরগাড়ি নেই। ক্লান্ত শরীরে ট্রেনেই ফিরতে হচ্ছে। স্কুলের মাস্টারমশাই কুঙ্কুমবাবু বলেছিলেন, 'গভীর বেদনার মধ্যেই কবিতার জন্ম হয়।' সিচুয়েশন এখন ঠিক সেই রকম-ই। শান্ত মনে-মনে কবিতাটা লিখে ফেলল—

হারু গেল হারিয়ে
সব মায়া উড়িয়ে
সোঁদরবন উজিয়ে—
বাড়ি ফিরি খুঁড়িয়ে
হারু যায় হারিয়ে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

হ্যারিয়েট বিচার স্টো-র আঙ্কল টম'স কেবিন উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমেরিকায় সাড়া পড়ে যায়। আব্রাহাম লিঙ্কন একবার বলেছিলেন, ওই বইখানিই আমেরিকার গৃহযুদ্ধের একমাত্র কারণ না হলেও যে বিশেষ কারণ, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এখন বলো, এখানে আসবার উদ্দেশ্যটা কী ? ও হ্যাঁ, দাঁড়াও, তার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক ।
আমরা আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি । আরব-এয়ারের রহস্যটারও সমাধান করতে হবে ।
আরব-এয়ার অতি পাজি ! বেইমান ! মক্কার পথে ওয়াদেসদায় ওদের ঘাটি করতে দিয়েছিলাম···
মাস তিনেক আগে আবদুল্লা বলে, ওয়াদেসদায় নামবার আগে ওদের একটা প্লেনকে আকাশে তিনবার ডিগবাজি খেতে হবে ।
বলেন কী !
সামান্য একটা অনুরোধ, অথচ আরব-এয়ার আমার ছোট্ট মিষ্টি আবদুল্লার কথা শুনতে রাজি হয় না ···
কিন্তু ···
তাতে আমি রেগে গিয়ে বলি যে, ওদের সঙ্গে আমার চুক্তি আমি নাকচ করে দেব । সেইসঙ্গে এটাও ফাঁস করে দেব যে, ওরা ক্রীতদাসের ব্যবসা চালায় ।
অ্যাঁ ?
গররর্
হ্যাঁ, সেনেগাল আর সুদান থেকে মক্কাযাত্রী দিয়ে প্লেন বোঝাই করে ওরা ওয়াদেসদায় আসে । যাত্রীরা গরিব ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান···
তারপর ?
তারপর আর তাদের ফিরতে দেখি না । ওয়াদেসদা আর মক্কার মাঝামাঝি কোনও জায়গায় নিশ্চয় বেচে দেওয়া হয় তাদের।
বলেন কী !
তা, আমার কথায় আরব-এয়ার চটে যায়, তারপর বজ্জাত বাব্-এল-আরকে হাত করে ঘটায় বিদ্রোহ । দাঁড়াও, ক্ষমতা ফিরে পেলেই বজ্জাতটাকে আমি খতম করব !!
গ্রেআআআও
উরেবাবা ! কুট্টুসটা আয়েশার কাছে যায়নি তো ?
ঝনাত
CRACK
গ্রেআও

শিল্পী : হার্জে । কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

ডিক্সন আর গাইলসকে ছেড়ে দেওয়ায় রোভার্সের ভক্তেরা দারুণ ক্ষুব্ধ

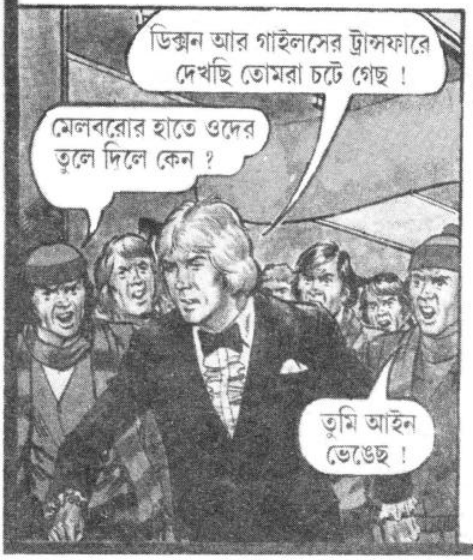

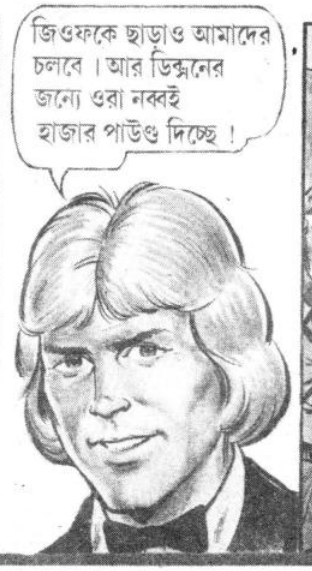

রয়ের গাড়ি চলে গেল…

রয় কি আমাদের বোকা বানাল নাকি ?

দেখা যাবে। কিন্তু ভাল বদলি চাই !

বদলি জোগাড় করতে রয় কিন্তু তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না !

কেমন আছ জিমি ?

দারুণ ! কিছু ব্যথা নেই !

ট্রেনারই সেটা ভাল বুঝবে।

মার্ভিনও দেখছি সুস্থ হয়ে উঠেছে !

মঙ্গলবারের খেলায় এই টিম নামাব !

১—সি কার্টার
২—এম প্রাইস
৩—ডি ম্যাকে
৪—এস নেলর
৫—জে স্লেড
৬—ভি গাথরি
৭—পি ডিয়াজ
৮—বি গ্রে
৯—আর রেস
১০—এম ওয়ালেস
১১—ভি এলিয়ট
অতিরিক্ত—এ লিঞ্চ

স্ট্যামব্রিজ সিটি ফার্স্ট ডিভিশনে উঠেছে ! আজ ওদের সঙ্গে রোভার্সের খেলা !

ক্রিটে হেরেছিলুম, তার শোধ তুলব !

আজ কী হবে, কে জানে !

নেলরকে কাটিয়ে স্ট্যামব্রিজ এগোচ্ছিল !

নেলর কর্নার করে বাঁচিয়েছে !

রয় অবশ্য পিছনেই ছিল !

কর্নার-কিক…

চার্লি তৈরি রয়েছে !

ও ঠিক ধরে ফেলবে !

কিন্তু…

উফ্ !

এই রে, ফশকেছে !

ডানকান, ক্লিয়ার করো !

কিন্তু….

এই রে !

সেমসাইড গোল !

সর্বনাশ !

নাঃ, মরশুমটাই খারাপ যাবে দেখছি !

এর পরে কী হবে, ভাবতে পারো ?

(আগামী সংখ্যায়)

এল সরীসৃপ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

উভচরের পর নতুনতর জীব এল সরীসৃপ। এদের আর নদীনালা কিংবা খালবিলের পিছুটান রইল না। এরা স্রেফ ডাঙায় শক্ত খোলাসুদ্ধ ডিম পেড়ে সেই ডিমে তা দিতে পারত। এতে সরীসৃপদের কত যে সুবিধে হত বলার নয়। এদের ডিমের শক্ত খোলের ভেতর নিরাপদে নরম শাঁসের ভিজে ভাব বজায় থাকছে। এই খোলা সছিদ্র হওয়ায় ভেতরে স্বচ্ছন্দে হাওয়া খেলতে পারে। অকালে জন্মে পৃথিবীতে যাতে বিপদে না পড়ে, তর জন্যে সরীসৃপের ভ্রূণ ডিমের কুসুম খেয়ে সময় নিয়ে খোলার ভিতর বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

উভচর ব্যাঙের আজও মুশকিল এই যে, তার ডিম জলের বাইরে আনলেই তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

উভচর প্রাণীদের ছিল আরও নানা অসুবিধে। ভাল করে হাঁটতে পারত না। চলত ঢিমেতালে। শরীরের দুপাশে ছ্যাতরানো ঠ্যাং মাটিতে ঠিক সমানতালে পড়ত না।

অন্যদিকে সরীসৃপদের ঠ্যাং ছিল দেহের সঙ্গে সাঁটা। ফলে, তারা মাটিতে শক্ত করে ভর দিতে পারত। হাঁ-মুখের বদলে পাঁজরার জোরে তারা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতে পারত। আর ছিল তাদের শরীরে রক্ত চলাচলের সুব্যবস্থা। সাধারণভাবে তাদের শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ছিল খুব কাজের।

অগ্রগতির মাপকাঠিতে, সরীসৃপরা যদি হাল আমলের মোটরগাড়ি হয়, তা হলে উভচররা হবে সেকেলে ছ্যাকরাগাড়ি।

এইসব সরীসৃপে এক সময়ে বনবাদাড় ছেয়ে গেল। জলস্থল তো বটেই, উড়ে এসে আকাশও তারা জুড়ে বসল। আদিকালের কিম্ভূত সরীসৃপ থেকে ক্রমে অসংখ্য রকমারি প্রাণীর জন্ম হল। তাদের কারও ইয়া লম্বা-লম্বা ঠ্যাং, মাটিতে চলার পক্ষে খুব দড়। সাপের মতন কারও বা ঠ্যাঙের বালাই নেই। কারও পা হল বৈঠার মতন ; তারা জলে ফিরে গেল। কারও বা ডানা গজাল ; দেখতে অনেকটা অতিকায় বাদুড়ের মতন। তাদের উরু থেকে পায়ের আঙুলের লম্বা-লম্বা হাড় অবধি টানা চামড়ার আস্তরণ। এই অদ্ভূতদর্শন ডানাওয়ালা সরীসৃপেরা কিন্তু তাই বলে পাখি ছিল না, এমনকী, পাখির পূর্বপুরুষও তারা নয়।

আসলে, পাখির পূর্বপুরুষ ছিল অন্য একদল সরীসৃপ। তাদের বলা হয় আর্কিওপটেরিক্স বা 'পুরা-পক্ষী'। পনেরো কোটি বছর পৃথিবীতে তাদের বাস ছিল। সবদিক থেকেই তারা ছিল সরীসৃপ। কিন্তু তাদের ডানাগুলো ছিল পালকের তৈরি।

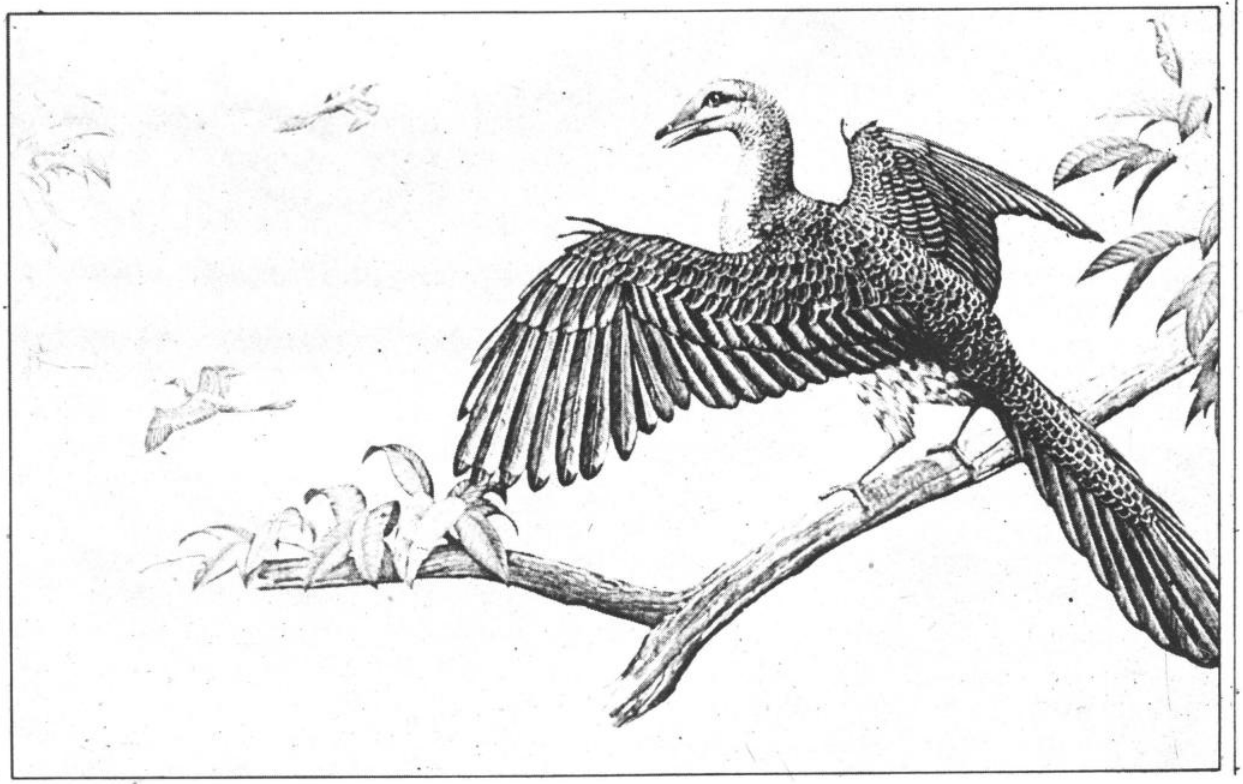

পুরা-পক্ষী আর্কিওপটেরিক্সের চেহারা ছিল মোটামুটি এইরকম। এদের ডানায় ছিল পালক, কিন্তু সেই সঙ্গে নখরও

সমুদ্র থেকে ডাঙায় উঠে বিশ্রাম নিচ্ছে মস্ত একটি সিল-পরিবার

সিল বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

বরফের দেশে যে-সব প্রাণী বাস করে, সিলমাছ তাদের মধ্যে অন্যতম। নামে মাছ হলেও, সিলমাছ কিন্তু মোটেই মাছ নয়। মাছেদের মতো এরা ডিম পাড়ে না। বাচ্চার জন্ম দেয়। সুতরাং এরা হল স্তন্যপায়ী প্রাণী।

উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ সমুদ্র-অঞ্চলকেই এরা বসবাসের জন্যে বেছে নিয়েছে। প্রায় সাতচল্লিশ রকমের সিল দেখা যায়, তাদের স্বভাব ও চরিত্রের মধ্যেও বেশ পার্থক্য আছে।

দক্ষিণমেরু অঞ্চলের সিল শুধুমাত্র কাঁকড়া খেয়ে বেঁচে থাকে। তাই এদের বলা হয় কাঁকড়া-খেকো সিলমাছ। অবশ্য অধিকাংশ জাতের সিলমাছই কাঁকড়া এবং সমুদ্রের ছোটখাটো মাছ খেয়ে জীবনধারণ করে। তবে লেপার্ড সিলের কথা আলাদা। রাক্ষুসে স্বভাবের এই ধূর্ত লেপার্ড সিলই হল, বরফ দেশের রানি, পেঙ্গুইনের সবচেয়ে বড় শত্রু। পেঙ্গুইনও অবশ্য হাতের কাছে জুতসই শিকার না পেলে ছোটখাটো সিলমাছের ঘাড়ে কামড় দিতে ছাড়ে না।

লেপার্ড সিল ছাড়া আর সব জাতের সিল স্বভাবে শান্তশিষ্ট, ভিতু এবং কিছুটা কুঁড়েও বটে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুঁড়ে হল হাতি সিল। লম্বায় প্রায় ২১-২২ ফুট। ওজন প্রায় চার টন। দেখতেও ভারী কুৎসিত! কিন্তু হলে কী হবে ভয়ানক ভিতু এরা। এত বড় চেহারা থাকা সত্ত্বেও ছোট-বড় সব ধরনের প্রাণীকেই এরা কম-বেশি ভয় পায়।

হাতি সিল ছাড়া আর সব সিলমাছই দেখতে কিন্তু মন্দ নয়। একটু বোকা-বোকা এই যা। মুখের আদল অনেকটা ইঁদুরের মতো হলেও, ইঁদুরের মতো ধূর্ত নয়। সাধারণত এরা ১০-১২ ফুট লম্বা হয়। মাথার নীচে পাখনার মতো দু'টো হাত থাকে। পিছনে থাকে মাছের মতো একটা লেজ, যা এদের চলাফেরা এবং সাঁতার কাটায় সাহায্য করে।

সিলমাছের গায়ের রঙ নানা রকমের। সাধারণত দক্ষিণমেরু অঞ্চলে যে-সব সিল পাওয়া যায়, তাদের গায়ের রঙ সাদা। হাতি সিলের গায়ের রঙ ধূসর। হার্প সিল নামে এক ধরনের সিলমাছ আছে, যার গায়ে থাকে লম্বা আর মোটা কালো দাগ। উত্তরমেরু অঞ্চলে সিলমাছ তেলতেলে, কালো আর লোমশ। এই অঞ্চলের আর এক ধরনের সিলমাছের গায়ে আঁকা থাকে গোল-গোল সাদা-কালো রঙের হরেক দাগ, যেগুলো দেখতে অনেকটা ছবির মতো।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ বাচ্চা হয় এদের। শিশু সিল দেখতে বেশ বড়সড়ই হয়। মা ছাড়াই একা একা ঘোরাফেরা করতে বেশি পছন্দ করে।

গোটা গ্রীষ্মকাল এদিক-ওদিক ঘুরে কাটিয়ে দেয়। তারপর শীত আসতে না আসতেই এরা ঘর তৈরির কাজে নেমে পড়ে। সমুদ্রে ভাসমান বরফের স্তূপকেই ঘর তৈরির জন্যে বেছে নেয় এরা। ছুঁচলো দাঁত আর সামনের দুটো হাত দিয়ে, শক্ত বরফ কেটে-কেটে সুড়ঙ্গের মতো ঘর তৈরি করে। আর এ-গর্ত থেকে ও-গর্ত লাফালাফি করে পুরো শীতকালটাই কাটিয়ে দেয়।

সিলমাছের চামড়া মোটা এবং শক্ত বলে বরফের দেশের মানুষ এস্কিমোরা পোশাক হিসেবে ব্যবহার করে। এ ছাড়াও সিলমাছের শরীরে থাকে প্রচুর পরিমাণে চর্বি। ভাবলে অবাক হতে হয়, একটি বড় হাতি সিলের চর্বি থেকে প্রায় দুশো গ্যালন তেল পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা তাই ভাবতে শুরু করেছেন, বরফের দেশে প্রচুর পরিমাণে সিলমাছ উৎপাদন করে তেলের অভাব কিছুটা পূরণ করা যায় কি না।

অর্থ জানো

পুঙ্গব…পরিবাদ…

কথাকে যদি বর্ণাঢ্য করতে চাও, ভাবকে যদি জমাট করতে চাও, স্পষ্ট করতে চাও, তবে যত শব্দ সঞ্চয় করবে, ততই তোমার লাভ। আর শব্দের মূল্য বুঝে নেবে তার অর্থ জেনে। নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **পুঙ্গব**—(ক) পুরুষ, (খ) ষাঁড়, (গ) মহিষ, (ঘ) শক্তিমান।

২। **সৌদামিনী**—(ক) চাঁদ, (খ) জ্যোৎস্না, (গ) সুন্দরী স্ত্রীলোক, (ঘ) বিদ্যুৎ।

৩। **পরিবাদ**—(ক) সম্পূর্ণ বাদ, (খ) নিন্দা, (গ) পরবর্তী কালে বাদ, (ঘ) কলহ।

৪। **পতিতপাবন**—(ক) পতিতের সহায়, (খ) পতিতের বন্ধু, (গ) পতিতের পবিত্রকারী, (ঘ) পতিতের ভগবান।

৫। **অনবহিত**—(ক) বিচ্ছিন্ন, (খ) অমনোযোগী, (গ) যা বহন করা হয়নি, (ঘ) নির্লিপ্ত।

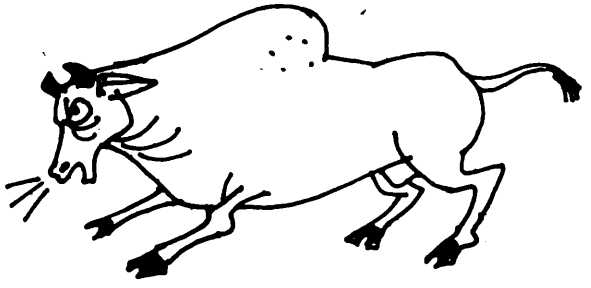

উত্তর : ১। **পুঙ্গব**—(খ) ষাঁড়। যেমন, 'সেই সাহেব-পুঙ্গবটি হন-হন করে বেরিয়ে গেল' (প্রমথ চৌধুরী)। এ-শব্দটি শ্রেষ্ঠ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, নরপুঙ্গব। 'কায়স্থপুঙ্গব রামনারায়ণের বুঝতে দেরি হল না' (তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়)।

২। **সৌদামিনী**—(ঘ) বিদ্যুৎ। যেমন, 'সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে' (কৃত্তিবাস)।

৩। **পরিবাদ**—(খ) নিন্দা, দুর্নাম। যেমন, 'এ কী পরমাদ দেয় পরিবাদ' (চণ্ডীদাস)।

৪। **পতিতপাবন**—(গ) পতিতের পবিত্রকারী। পতিত শব্দের একটি অর্থ হল পাপী। পাবন অর্থ শোধক। মোট অর্থ হল যিনি পাপীকে পাপমুক্ত করেন। যেমন, 'পতিতপাবন সীতারাম'।

৫। **অনবহিত**—(খ) অমনোযোগী। যেমন, 'তুমি এ বিষয়ে ক্ষণমাত্রও অনবহিত থাকিবে না' (বিদ্যাসাগর)।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

দেশী জিনিস

খিদিরপুরের কোন বাজার থেকে চম্বলের কে যেন এক বন্ধু একটা বিদেশী ঘড়ি কিনে এনেছে। তার ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল সেই ঘড়ি দেখে। এখন চম্বল ঝোঁক ধরেছে, পয়সা জমিয়ে ওই রকম একটা ঘড়ি সেও কিনবে।

But his father fails to understand why Chambal should set his heart on a foreign watch, one that has been smuggled into the country.

"We are making excellent watches in this country these days. They are in demand in many foreign countries, too, I'm told. Why can't we be content with them?" he demanded.

"Do we export watches to other countries?" Chambal asked in some surprise. "I thought we only exported raw materials."

"Watches," said Mr Roy, "and many kinds of machinery. And when you find people buying smuggled trousers and shirts from wayside hawkers, don't, for a moment, suppose we don't make very good shirts, trousers and other clothing here in India. Do you remember the day we went to that auction in Park Street to buy some pieces of furniture? Heaps of foreign clothing were on sale on the pavement. Most of it is used stuff, I'm told. It's astonishing that people should pay good money for it."

এবারেও কয়েকটি শব্দ লক্ষ করো, যার বহুবচনের রূপ ইংরেজিতে ব্যবহার করা হয় না। এর প্রত্যেকটিই আলাদা-আলাদা জিনিসের সাধারণ নাম :

machinery, clothing, furniture

many kinds of machinery; shirts, trousers and other clothing; pieces of furniture

প্রসাদ

ওটা নকল জোড়া শালিক, তাই ওর গুণ নেই···

জোড়া শালিক

অমল আচার্য

ইস্কুলে যাওয়ার আগে টিকু এ-জানলা ও-জানলা করছিল জোড়া শালিক দেখার আশায়। এটা ওর প্রতিদিনের ব্যাপার। জোড়া শালিক দেখে বার হলে ক্লাসে পড়া পারা যায়। বন্ধুরা বলেছে। কথাটার হাতেনাতে প্রমাণও পেয়েছে। যেদিনই এক শালিক দেখে ইস্কুলে গেছে, কপালে জুটেছে দুর্ভোগ। কানমলা, নীল ডাউন, গাঁট্টা, জিভ বার করে পুরো পিরিয়ড দাঁড়িয়ে থাকা, এইসব। সেই থেকে রোজ জোড়া শালিক দেখে বার হওয়ার চেষ্টা করে টিকু।

কিন্তু জোড়া শালিক দেখব বললেই কি চট করে দেখা যায় ? জোড়া শালিকের ফ্যাচাংও বিস্তর। দুটোর মধ্যে এক হাতের বেশি ব্যবধান হলেই সেটা আর জোড়া শালিক নয়। সুতরাং দু'শালিক হরদম দেখা গেলেও টিকুর সংজ্ঞা মতন জোড়া শালিক দেখা পাওয়া ভার। তাই বেশির ভাগ দিনই টিকুকে নিরাশ হতে হয়। জোড়া শালিক দেখতে গিয়ে মাঝখান থেকে এক শালিক দেখে ফেলে, আর ইস্কুলে গিয়ে নাকানিচোবানি খায়। ইদানীং বহরটা বেড়েও গেছে।

বাবা কত বলেছেন, 'এসব কুসংস্কার। বিজ্ঞানের যুগে মানায় না। মন দিয়ে পড়াশোনা করলে পারবে না কেন ? পড়া পারলে শাস্তির প্রশ্নও ওঠে না। জোড়া শালিক দেখার আশায় সারা সকালটা নষ্ট করছ, পড়ছ কই ? তা পড়া পারবে কী করে ?'

বাবার কথায় টিকুর বিশ্বাসে একটুও আঁচড় লাগে না। বরং বেড়েই চলে। বিরক্ত হয়ে মা জানলা বন্ধ করে দেন। বাইরে চোখ না গেলেই হল। তাতে মেয়ের শালিক-বাতিক যদি একটু কমে !

কিন্তু জানলা বন্ধ করায় টিকুর আপত্তি। জানলা বন্ধ থাকলে যতই পাখা চলুক, গরম। তারপর যদি লোডশেডিং হয় তো হয়ে গেল। অন্ধকার-অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিয়ে পড়তেও অস্বস্তি। দিনের বেলায় কি আলো ভাল লাগে ? তাই জানলা খুলে দেয় টিকু। আর জানলা খোলা মানেই এক শালিক চোখে পড়া। তখন নাগাড়ে চলে দু'শালিক দেখার তোড়জোড়। যতক্ষণ না দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ বইয়ের মতো বই পড়েই থাকল। এই করতে-করতে ন'টা। তখন চান, খাওয়া, সাজগোজ করতে-করতেই সময় হয়ে যায়। দৌড়ঝাঁপ করে ইস্কুলে না ছোটা ছাড়া উপায় থাকে না।

আর দৈবাৎ যদি জোড়া শালিকের দর্শন মিলল তো আর-এক ঝামেলা। অমনি দরজা-জানলার পর্দা ফেলে দেবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটবে। ডাহিনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে তাকাবে না ইস্কুলে না-পৌঁছনো পর্যন্ত। যদি ফের এক শালিক দেখে ফেলে ? তা হলে তো জোড়া শালিক দেখার সব পুন্যি মাটি।

কিন্তু জোড়া শালিক দেখা কপালে কদাচিৎ ঘটে। ঘটলেও সবদিন ফল খুব একটা ভাল হয় না। তখন ভেবেছে, নিশ্চয় শালিক দুটো একহাতের বেশি দূরত্বে ছিল, নিশ্চয় তার দেখার মধ্যে ভুলচুক থেকে গিয়েছিল।

প্রতিদিনের মতো টিকু আজকেও জানলার এদিক-ওদিক সরে গিয়ে, নিচু হয়ে, উঁচু হয়ে, শিক ধরে ঝুলে, জানলার ওপর দাঁড়িয়ে, কাত হয়ে, উপুড় হয়ে চোখ ঘোরাচ্ছিল জোড়া শালিক দেখার আশায়। দেখতে না পাওয়ার দরুন তার চোখে-মুখে হতাশা, কষ্ট, চাপা যন্ত্রণা···।

মা ছুটে এসে কাঁদো-কাঁদো গলায় বাবাকে বললেন, "তুমি যা-হয় একটা কিছু করো। মেয়েটার রোগ ধরে গেল। আমি আর দেখতে পারছি না।"

বাবাও তাই ভাবছিলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, "এটা একটা ম্যানিয়া। এর থেকেই মানসিক রোগ দেখা দেয়।"

মা কেঁদে ফেললেন। "মানে, পাগলামির কথা বলছ ?"

"ব্যাপারটা তাই।" বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"তা হলে ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন ?" মা'র অস্থিরতা।

"ঝট্ করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে নেই। তাতে ঝুঁকি অনেক। দেখি কী করা যায়।"

সেদিন সন্ধেয় টিকুদের বাড়ি বড়জ্যাঠা, ছোটমামা আর পিসেমশায় এসে হাজির। টিকু টিভি দেখছিল। বলল,

"তোমরা পাশের ঘরে গিয়ে গল্প করো। প্রোগ্রামটা দেখে যাচ্ছি।"

পাশের ঘরে সব গোল হয়ে বসে শলাপরামর্শ করতে লাগল। সব শুনে-টুনে পিসেমশাই বললেন, "তোমরা যুক্তি দিয়ে ওকে বোঝাতে পারছ না। তাই ও অন্ধবিশ্বাসটা ছাড়তে পারছে না। সংস্কার কার মধ্যেই বা নেই ? বারো-তেরো বছরে ছেলেমেয়েদের মনে উদ্ভট বিশ্বাস জন্মেই থাকে। শেখাই আমরাই। ঠিকমতো বোঝাও, বিশ্বাস ভেঙে যাবে।"

ছোটমামার বয়েস কম। মিটিমিটি হেসে বললেন, "এক কাজ করলে কেমন হয় ? একজোড়া শালিক কিনে এনে যদি খাঁচায় রাখা যায় ? রোজ জোড়া শালিক দেখে ইস্কুলে যেতে পারবে।"

কথাটা বাবা-মা'র মনে ধরে গেল। তবে বড়জ্যাঠা সামান্য হেসে বললেন, "কাজটা করে দেখতে পারো। ওতে বিশ্বাসটা ভাঙবে কিন্তু রোগ সারবে না।"

এমন সময় টিভি বন্ধ করে টিকু এ-ঘরে এল। বড়জ্যাঠা কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "টিভিতে কী প্রোগ্রাম দেখছিলে মা ?"

"চিচিংফাঁক।"

"আর কী-কী প্রোগ্রাম দেখে থাকো ?"

"সব।"

"সব দ্যাখো ?"

"হুঁ-উ-উ।" গর্ব করে বলল টিকু।

"তা হলে পড়ো কখন ?"

"কেন, সকালে ?"

বড়জ্যাঠা হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, যাও।"

যাওয়ার সময় বড়জ্যাঠা বাবাকে কানে-কানে বলে গেলেন, "টিভিই হচ্ছে যত নষ্টের মূল। বাড়িতে যদি টিভি থাকে, মাধ্যমিক স্টেজ পার না হওয়া পর্যন্ত মেয়ের রোগ সারছে না।"

বড়জ্যাঠার পরামর্শটা মায়ের পছন্দ হল না, যতটা হল ছোটমামার পরামর্শ। বাবা সময় নষ্ট করতে নারাজ। কারণ টিকুর পর-পর দুটো মান্থলি পরীক্ষার রেজাল্ট বড়ই শোচনীয়। বড়দি অভিভাবককে ডেকেছিলেন। আর একটা মান্থলির পরেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। সুতরাং পরের রোববারেই বাবা হাতিবাগান থেকে খাঁচায় জোড়া শালিক ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

টিভি দেখে আর জোড়া শালিকের সেবাযত্ন করে টিকুর দিন বেশ ভালই কাটছিল। বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতোই বুড়ি-ছোঁয়া রইল।

টিকু রোজ খাঁচার দিকে তাকিয়ে তিনবার জোড়া শালিক নমস্কার করতে করতে ইস্কুলে বার হয় আর ইস্কুলে গিয়ে আগের মতোই এক-শালিক দেখার ফল লাভ করে। শেষ মান্থলি পরীক্ষার যে রেজাল্ট বার হল, তা আগের দুটোর থেকেও ভয়াবহ।

বাবা বললেন, "এখন তো জোড়া শালিক দেখে বার হও, তবু এরকম হচ্ছে কেন ?"

টিকুও ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে অনেক। ভাবতে ভাবতে সিদ্ধান্তও করে ফেলেছিল। তাই বাবা প্রশ্নটা করায় সে চটপট উত্তর দিল, "খাঁচায় বন্দী করে জোড়া শালিক বানানো হয়েছে। ওটা নকল জোড়া শালিক। তাই ওর গুণ নেই।"

যা কোনওদিন করেন না, বাবা তাই করলেন। প্রচণ্ড ধমক মেরে বললেন, "জোড়া শালিকের বুজরুকি মাথা থেকে হঠাও। অ্যানুয়াল পরীক্ষার আর মাত্র মাসখানেক বাকি। টিভি দেখা বন্ধ করে লেখাপড়ায় মন দাও।"

গ্রহের এমনই ফের, পরের দিনই টিভির পিকচার টিউব খারাপ হয়ে গেল। হাজার টাকার ধাক্কা। অত টাকা বাবার হাতে নেই এখন। তা ছাড়া বড়জ্যাঠার কথাটাও বাবার মনে পড়ে গেল। এই হল মোক্ষম সুযোগ। টিভি না সারিয়ে একমাস দেখাই যাক না কী দাঁড়ায় ? সুতরাং টিভির শাটার বন্ধই রইল।

প্রথম তিন-চার দিন খুব অস্বস্তিতে কাটল টিকুর। কিন্তু অন্য কারও বাড়িতে টিভি দেখতে যাওয়ায় তার ঘোর আপত্তি। বাড়ির টিভি অচল থাকায় হাতে প্রচুর সময়। সময়, বাবার বকুনি, ইস্কুলের শাস্তি, খারাপ রেজাল্টের জ্বালা, বন্ধুদের গোপন টিটকিরি, সবকিছু তাকে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে বাধ্য করল। কিছুদিনের মধ্যে তার ফলও ফলতে লাগল। রোজ ইস্কুলে পড়া পারে, দিদিরা প্রশংসা করেন, উৎসাহ দেন, ভালবাসেন, বন্ধুরা বাহবা দেয়, বাবা-মা স্নেহ করেন, অমৃতের স্বাদ পেল টিকু। অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল করার জন্যে সে উঠেপড়ে লাগল।

রেজাল্ট আউটের দিন ইস্কুলের মাঠে অনেক অভিভাবক। তাদের মধ্যে টিকুর বাবা-মা'ও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। ভয়ে তাঁদের বুক টিপ-টিপ করছিল। মা একসময় দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বসেই পড়লেন। তাঁর মাথা ঘুরছিল। এমন সময় রেজাল্ট হাতে নিয়ে টিকু হাসি-হাসি মুখে বেরিয়ে এল। বাবা-মাকে প্রণাম করে বলল, "ফার্স্ট হয়েছি।"

তাঁরা আনন্দে টিকুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আর, বাড়ি ফিরেই টিকু খাঁচা খুলে চিরদিনের মতো জোড়া শালিক উড়িয়ে দিল।

ছবি : দেবাশিস দেব

লালমনুয়া

সত্যেন্দ্র আচার্য

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। হঠাৎ বাইরে হৈচৈ। সামনে পরীক্ষা, পড়বার জন্য তৈরি হচ্ছি, তবু কান রাখলাম বাইরে। রাস্তার কিছু কুকুর ভীষণ চেল্লাচ্ছে। কিছু বাচ্চা ছেলে হাততালি দিচ্ছে একনাগাড়ে। কলরব করছে। ভালুক খেলার ভালুক কি বানর খেলার জোড়া-বানর রাস্তা দিয়ে গেলে সব পাড়ায় কিছু বাচ্চা ছেলে যেমন করে।

বিনু আর আমি মুখ-চাওয়াচায়ি করলাম। ঠিক তক্ষুনি মূর্তিমান এসে হুঙ্কার দিলেন, "প্রণাম কর।" তারপর সেই বিকট গলায় আবার যেন হুঙ্কার ছাড়লেন, "এই পাড়ার বাচ্চা আর কুকুরগুলোকে অ্যায়সা একদিন ডোডো চালাব না!" সঙ্গে সঙ্গে যুযুৎসু প্যাঁচের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করলেন ডোডোমামা। "অ্যায়সা, অ্যায়সা। ঠেলা তখন বুঝবে!"

"আরে ডোডোমামা কে?"

"হুঁ।" ডোডোমামা যথারীতি টেবিলের ওপর থেকে বই-খাতা সব টান মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়ে লাল কাপড়ে জড়ানো ছোট্ট একটা মোড়ক টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললেন, "জাদুঘর এখন আমার হাতের মুঠোয়। পৃথিবীর দশম আশ্চর্য আর পরম বিস্ময় এই লাল শালুর ভেতর। বুঝলি?"

বিনু আর আমি তো অবাক। বিনু একটু চটপটে আর কথা বলে বেশি। বলল, "ডোডোমামা প্রণাম হই।" বিনু হেঁট হলে ডোডোমামা সঙ্গে-সঙ্গে পদ্য বানালেন, "বিশ্বে বাধাব হৈচৈ।"

ডোডোমামা এসেছিলেন গত শীতে। অন্য চেহারায়। ভটভটি চড়ে। বিকল মোটর-সাইকেলের সিটের ওপর বসে দু'দিকে মাটিতে পায়ের তাল ঠুকে-ঠুকে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। সাজবেশ ছিল খেলোয়াড়ের মতো। আজকের ড্রেস অন্যরকম। একটা লাল আলখাল্লায় সর্বাঙ্গ ঢাকা। মোহান্তদের মতো মাথায় লাল পাগড়ি, কাঁধে লাল কাপড়ের ঝোলা। কপাল জুড়ে লাল সিঁদুরের টিপ। লম্বা দাড়ি। কিন্তু গাড়ির নীচের দিক গার্টার দিয়ে বাঁধা। বিনু যেন খুশি করতে চাইল ডোডোমামাকে। বলল, "আহা! কী অপূর্ব কলেবর!" ডোডোমামা তৎক্ষণাৎ টেবিলের ওপর রাখা সেই লাল কাপড়ে মোড়া বস্তুটির ওপর দৃষ্টি রেখে ছড়া কেটে বললেন, "সেই সঙ্গে জাদুঘর।"

কিন্তু বাইরে হট্টগোল তখনও থামেনি। কুকুরগুলো ডেকে যাচ্ছে। বাচ্চাগুলো যে যার খুশিমতো কী সব বলতে বলতে হাততালি দিচ্ছে সমানে। দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আমি তো অবাক। বিনুও হতভম্ব। ডোডোমামা ছড়ার সুরে ধাঁধা বানিয়ে আমাদের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিলেন। বললেন :

ব্যঞ্জনের তিন আর ত-বর্গের চার
স্বরবর্ণের 'আ' মেলালে নামটি পাবে তার।

দরজায় বাঁধা আছে সর্বাঙ্গ লাল রঙের কাপড়ে মোড়া একটা জন্তু। গলায় দুলছে জবাফুলের মালা। কপালে সিঁদুর। মোজা পরার মতো করে চারটি পায়েই জড়ানো লাল কাপড়। শুধু লেজটুকু চোখে পড়ে। জীবটি যে কী তা চট করে ধরা

বেশ শক্ত। চেহারা খানিকটা অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো "ডোডোমামা, আমি-ডেকেছি।"

হিহি, হিহি, ডোডোমামা হাসছেন। সামনের দুটো সোনা-বাঁধানো দাঁত চকচক করছে। হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ছড়া কাটলেন :

রান্নাঘরে তড়িঘড়ি খবর দিতে যা না
সেই সঙ্গে আনতে বলিস লালমনুয়ার খানা

"লালমনুয়া!" বিনু বলে, "লালমনুয়া তো পাখি ডোডোমামা। ওটা তো জন্তু।" ডো ডো মামা ব্যাখ্যা দিলেন, "এই যে দেখছিস একটা ছোট্ট মোড়ক, তবে এটাকে জাদুঘর বলছি কেন?"

চট করে আমরা দু'জনে ভেতরে গেলাম এবং দুজনেই ধাঁধার উত্তর খুঁজতে লাগলাম। ব্যঞ্জনের তিন অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণের তৃতীয় অক্ষর 'গ' আর ত-বর্গের চতুর্থ অক্ষর 'ধ', তার সঙ্গে 'আ' মেলাতেই উত্তর মাথায় এসে গেল। ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে বিনু বলল, "ডোডোমামা, ওটা একটা গাধা।"

হঠাৎ এই বাচ্চা গোছের গাধাটা যে কেন ডোডোমামার সঙ্গী, তা জানবার আগেই ডোডোমামা বললেন, "পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য তোদের জানা, অষ্টম নবম লালমনুয়ারও অজানা। দশম হল এই বস্তুটি।"

"ওটা কী ডোডোমামা?"

"চিঠি।"

"চিঠি?" অবাক গলায় আমরা জিজ্ঞেস করলাম।

"কবে লেখা হয়েছিল জানিস?"

"কবে ডোডোমামা?"

"আজ থেকে ছাব্বিশ বছর ছ'মাস সতেরো দিন আগে।"

"কোথায় পেলেন ডোডোমামা?" বিনু জিজ্ঞেস করল।

"বিন্ধ্যাসবে।"

"বিন্ধ্যাসব? সেটা কোথায় ডোডোমামা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ভারতবর্ষে।"

"অথচ হাসবার উপায় নেই। তা হলেই ডোডোমামা মাথার ওপর গাঁট্টা মেরে তবলা বাজাবেন। শুধু বললাম, "ও।"

ডোডোমামা বস্তুটির দিকে চোখ রাখলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বিন্ধ্যাচল পর্বতমালার দক্ষিণ দিকের কোনাকুনি বিন্ধ্যাসব রাজ্য। দস্যু জগনুর হাতে রাজা নিহত হন। রাজার সবকিছু লুঠতরাজ হয়। দস্যু জগনু সবকিছু গরিব দুঃখীদের ভেতর দান করে দেয়। সে কথা পরে বলছি।

"তো আমি চলেছি বিন্ধ্যারণ্যে। সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। একমাত্র সম্বল আমার যুযুৎসুর প্যাঁচগুলো। যার মোক্ষম প্যাঁচে বাছাধন বাঘ-সিংহ এক ঘাটে জল খাবে। চলেছি, চলেছি, চলেছি। আমার কাজ হল বাঘ-সিংহের সংখ্যা গণনা। কিন্তু হঠাৎ থামতে হল আমাকে। ঠিক অরণ্য-মুখেই একটা রাজপ্রাসাদ। জরাজীর্ণ। এককালে জনবসতি হয়তো ছিল এখানে। এখন অরণ্যভূমি। অরণ্যের মুখেই এই ভগ্ন, জীর্ণ প্রাসাদ। ভেতরে মানুষজন আছে বলে মনেই হয় না। তবু হাঁকলাম, 'কে আছ?' কোনও সাড়া এল না।

"দূরে পাহাড়। বিন্ধ্যাচল পর্বতমালা। ঘন অরণ্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। যেন লক্ষহস্তী সারবন্দী দাঁড়িয়ে আছে। আবার চিৎকার করলাম, 'কে, কে আছ?'

"না এবারেও কোনও সাড়া এল না। সন্ধ্যা নামতে আর বেশি দেরি নেই। সূর্যের আলো অনেক আগেই মরে গিয়েছিল। চুপিচুপি প্যাঁচগুলো আর একবার ঝালিয়ে নিলাম। তারপর ঢুকে গেলাম ভেতরে।

"আশ্চর্য! কেউ নেই। ভাঙা অট্টালিকা। কোথাও পাহাড়ি গাছ দেওয়াল ভেদ করে আকাশে মাথা তুলেছে। এখানে-ওখানে পাহাড়ি বনঝোপ। বাঁ দিকের বারান্দা পার হতেই সেই আর্ত চিৎকার। 'কে, কে?' আমি আরও জোরে চিৎকার করে উঠলাম।

"কিন্তু পরক্ষণেই সব চুপ। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। অন্ধকার নেমে আসছে। সবকিছু আর এখন পরিষ্কার চোখে পড়ে না। ছাদ কবেই ধসে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তাই আকাশ চোখে পড়ে। আকাশে এখন দু-একটা তারার উঁকিঝুঁকি। একটু দাঁড়ালাম। ভাবলাম। হঠাৎ সেই শব্দ। 'কে?' আবার চিৎকার করলাম। শুধু সেই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেখলাম, একটা বিরাটকায় পাখি দ্রুত বেগে এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেল।

"আমিও এগোলাম। বিকট দুর্গন্ধ নাকে আসছে। দাঁড়ালাম। বিরাট হলঘরের মতো জায়গা খানিকটা। হয়তো রাজার দরবার ছিল এটা। হঠাৎ সেই আর্তনাদ। যেন কেউ মৃত্যু-যন্ত্রণায় মাঝে-মাঝে এই শব্দ করে উঠছে।

"এবারে আর কোনও কথা নয়, শব্দকে অনুসরণ করে সেই দিকে চুপিচুপি এগোলাম। এই হলঘর পার হয়ে বিরাট চত্বর। উঠোনের মতো পাশে একটা বিশাল কুয়ো। জল আছে কি না তাও অন্ধকারে বোঝা যায় না। কুয়োর পাশে সেই ছোট্ট ঘরটা। ঘর বলতে খানিকটা জায়গা। জানলা-দরজা কিছু নেই। ছাদ নেই।

"চুপিচুপি এগিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। আর তাতেই মূর্তিটা চোখে পড়ল। মৃদু চাঁদের আলোয় মনে হল চিত হয়ে একজন মানুষ শুয়ে আছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় মাঝে-মাঝে কাতর শব্দ উঠে আসছে তার গলা দিয়ে। আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। কঙ্কালসার মূর্তি। বৃদ্ধ। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই মূর্তিটা পরিষ্কার হিন্দিতে বলল, 'এত দেরি করে এলি?'

"বুঝলাম কারও অপেক্ষা করছিল মূর্তিটা। কেউ আসবে। ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বললাম, 'আমি পরদেশী।'

"লোকটা একটু পাশ ফেরার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। বলল, 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে তুমি এসেছ। সিন্দুকটা খোলো।'

"মাথার কাছে বিরাট একটা লোহার সিন্দুক। সমস্ত শক্তি দিয়ে ডালাটা খুললাম। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে না। হাত বুলিয়ে দেখলাম। হঠাৎ হাতে ঠেকল সেই বস্তুটি। তুললাম। লোকটা বলল, 'এবার আমি তৃপ্তিতে যেতে পারি। আঃ!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি ঘুমোই। ডাকিস না।' একটা শব্দ উঠল লোকটার গলা দিয়ে। পরীক্ষা করে বুঝলাম লোকটা মারা গেছে।

"কী করি, সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে অনেকটা রাত পার হয়ে গেল। কী আছে এই মোড়কে! বহুমূল্য কোনও হিরের টুকরো, মরকতমণি, না বিষাক্ত কোনও বস্তু, যার স্পর্শে এক্ষুনি আমি প্রাণ হারাব। ভোরের আলোয় সন্তর্পণে খুললাম, আর খুলেই অবাক। একটা পোস্টকার্ড।

"সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দক্ষিণের চাতাল পার হয়ে শেষ ঘর। হয়তো বন্দিশালা ছিল আগে। সেই ঘরের ভিতর উঁকি দিতেই অবাক। বাচ্চা ওই লালমনুয়া অবাক চোখে আমাকে দেখছে। মাটিতে পড়ে আছে মৃত তার মা। দুর্গন্ধে দাঁড়ানো যায় না।

"লালমনুয়াকে নিয়ে কুয়োর পাড়ে এসে বসলাম। জল নেই। ইট, কাঠ, পাথরের টুকরোয় ভর্তি। পড়লাম চিঠিটা। আশ্চর্য! খুদে-খুদে অক্ষর, অথচ কী স্পষ্ট। গুনে-গুনে দেখলাম, দুশো লাইনে লেখা নিজের দস্যু-জীবনের ইতিহাস। পরিষ্কার শিল্পকর্মে দস্যু জগনু তার জবানবন্দী লিখে রেখে গেছে এই চিঠিতে। কিন্তু কোনও ঠিকানা লেখা নেই।"

একটু থেমে ডোডোমামা বললেন, "এই কলকাতায় চালের ওপর হয়তো সরস্বতীর মূর্তি দেখেছিস তোরা, ধানের ওপর রবীন্দ্রনাথের মুখ, সুপুরির ওপর দুর্গা-প্রতিমা। স্বদেশ কিংবা বিদেশের জাদুঘরে হয়তো দুশো লাইনের পোস্টকার্ড দেখতে পাবি। কিন্তু বিন্ধ্যাসব রাজমহলের পরিত্যক্ত কুঠিতে মৃত জগনু-দস্যুর সারাজীবনের খুন-জখমের ইতিহাস কোথাও খুঁজে পাবি না।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডোডোমামা বললেন, "পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ধরবে কাকে বল? লালমনুয়াকে?"

ছবি : দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আবার কুমেরু-অভিযান

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য

পৃথিবী যে-রেখায় আবর্তন করে কুমেরুবিন্দু বা দক্ষিণ মেরু (৩০° দঃ অক্ষরেখা) সেই কাল্পনিক রেখায় অবস্থিত। সব দ্রাঘিমাই দক্ষিণ গোলার্ধে এই কুমেরুবিন্দুতে এসে মিলে যায়। কুমেরুবিন্দু হচ্ছে পৃথিবীর মেরুরেখার ঠিক নীচের বিন্দু। এই বিন্দু থেকে প্রায় ৭০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত মহাদেশই কুমেরু মহাদেশ (আণ্টার্কটিকা)। কুমেরু মহাদেশে গ্রীষ্মকালে সূর্য ঠিক মাথার ওপরে এক জায়গায় স্থির থাকে। এই মহাদেশের আয়তন ভারতের প্রায় চারগুণ, ভারত ও চিনের যুক্ত আয়তনের চেয়েও বড়। এখানকার শীতে (মে-জুলাই) এই মহাদেশের সংলগ্ন সমুদ্র জমে বরফ হয়ে যায়, তখন এর আয়তন দাঁড়ায় ভারতের প্রায় পাঁচগুণ। সমুদ্রের সব জলই অবশ্য বরফ হয়ে যায় না ; জলের ওপরের তিন-চার মিটার পর্যন্ত পুরু বরফে পরিণত হয়। অনেকটা দুধের ওপর পুরু সরের মতো। এই বরফের নীচে থাকে সমুদ্রের জল। শীতকালে এই জমাট সমুদ্র ৬০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। উত্তর গোলার্ধে এরকম অবস্থা হলে জমাট সমুদ্র প্রায় লেনিনগ্রাদ শহর পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

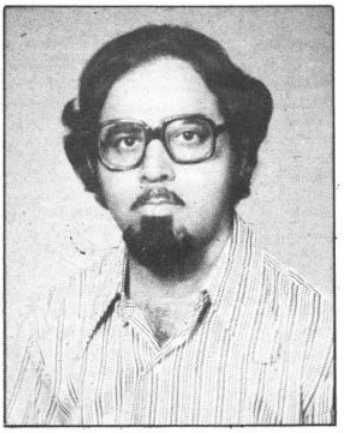

ধানবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস-এ ফলিত ভূপদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান শ্রীবিমলেন্দু ভট্টাচার্য ছিলেন চতুর্থ ভারতীয় কুমেরুমহাদেশ অভিযানের দলনেতা। এই রচনায় তিনি সেই অভিযানের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। সেইসঙ্গে পরিবেশন করেছেন যে-তথ্যসম্ভার, যাত্রাপথসহ কুমেরুমহাদেশের একটা স্পষ্ট পরিচয় যে তার ভিতরে পাওয়া যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। পড়ো সেই অভিযানের বৃত্তান্ত।

কুমেরু মহাদেশের প্রায় সবটাই পুরু বরফের চাদরে ঢাকা। কেবল দুই-শতাংশ জায়গায় পাথুরে জমি পাওয়া যায়। বরফের মরুভূমিতে এই পাথুরে জমি মরূদ্যানের মতো, তাই ইংরেজিতে এই পাথুরে জমিকে ওয়েসিস বলা হয়। কুমেরু মহাদেশের ওপরকার বরফের চাদর কেবল স্থলভাগকেই ঢেকে ফেলে না, এই আস্তরণ স্থলদেশ ছাড়িয়ে সমুদ্রের ওপরও কিছুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সমুদ্রের ওপর ছড়ানো এই বরফের আস্তরণকে বরফের পাটাতন (ice-shelf) বলা হয়। এই পাটাতন ১০০ থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত পুরু। মোটামুটি স্থায়ী এই পাটাতনের বড়, মাঝারি ও ছোট টুকরো মাঝে-মাঝে ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং সমুদ্রের জলে ভাসতে থাকে। এই ভাসমান বরফের পাটাতনের টুকরোকেই হিমশৈল (ice-berg) বলা হয়। বরফের পাটাতন ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে আমাদের দেশে বন্যায় নদীর পাড় ভেঙে যাওয়ার একটা মিল আছে। হিমশৈলের ওপরের ভাগ প্রথমদিকে সমতল থাকে, কারণ বরফের পাটাতন সমতল। ভাসতে-ভাসতে হিমশৈলের নীচের দিকটা গলতে থাকে এবং কিছুদিন পরে হিমশৈল ভারসাম্য হারিয়ে হয় কাত হয়ে যায়, নয় উলটে যায়। এইজন্যেই আমরা বিভিন্ন আকারের হিমশৈল দেখতে পাই। কিন্তু যে-কোনও হিমশৈলেরই ওপরটা প্রথমদিকে সমতল থাকে। হিমশৈল যখন জলে ভাসে, তখন ন'ভাগের একভাগই কেবল জলের ওপর থাকে, বাকি আট ভাগই থাকে জলের নীচে। কুমেরু মহাদেশ অঞ্চলে জলের ওপর ১৫-২০ মিটার উঁচু হিমশৈল অহরহই দেখা যায়। অতএব এ-সমস্ত হিমশৈলের ১২০ থেকে ১৬০ মিটার পর্যন্ত জলের নীচে থাকে। হিমশৈল লম্বায় কয়েক কিলোমিটার থেকে কয়েকশো কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিমশৈল পাওয়া গেছে কুমেরু মহাদেশ অঞ্চলেই ১৯৫৬ সালে। এই হিমশৈল লম্বায় ছিল ৩৩৪ কিমি ও চওড়ায় ৯৬ কিমি।

বরফ ও শীতের দাপটে মানুষের পক্ষে কুমেরু মহাদেশে যাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। ১৭৭২ সালে বিখ্যাত

ঋতু-পরিবর্তনের ফলে কুমেরু মহাদেশের আয়তন বাড়ে-কমে। এ হল গ্রীষ্মকালের আয়তন

শীতে সেই আয়তন কতটা বেড়ে গেছে দ্যাখো

অভিযাত্রী জেমস কুক তাঁর দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করেন কুমেরু মহাদেশের খোঁজে। তিন বছর ধরে চলে এই অভিযান। প্রায় এক লক্ষ কিলোমিটার ঘুরেও কুক ও তাঁর দলের লোকেরা দেখতে পেলেন না কুমেরু মহাদেশের স্থলভাগ। শেষ পর্যন্ত তিনি ৭০° দঃ অক্ষরেখা বরাবর কুমেরুবিন্দুর বৃত্ত পরিক্রমা করেই ফিরে আসেন। জমাট সমুদ্র, হিমশৈলের প্রাচীর, খারাপ আবহাওয়া ইত্যাদির জন্যে তিনি মহাদেশের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। কুক নিজের ডায়েরিতে এই অভিযানের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন, "এই মহাদেশের উপকূল এতই দুর্গম যে, এই মহাদেশ কোনও দিনই আবিষ্কৃত হবে না।" কিন্তু কুকের মতো দুঃসাহসী অভিযাত্রীকেও ভ্রান্ত প্রমাণ করে ব্রিটিশ অভিযাত্রী ব্রান্সফিল্ড, আমেরিকান নাবিক পামার ও রুশ অভিযাত্রী বেলিংহাউসেন কুমেরু মহাদেশ বা নিকটবর্তী দ্বীপগুলোতে পা রাখতে পেরেছিলেন। ১৯০১ সালে ক্যাপ্টেন রবার্ট স্কট কুমেরুবিন্দুর অভিযানে রওনা হন 'ডিসকভারি' জাহাজে। স্কটের দলকে কুমেরুবিন্দুর ৫০০ কিমি দূর থেকেই খারাপ আবহাওয়ার জন্য ফিরে আসতে হয়। ১৯০৭ সালে 'নিমরড' জাহাজে করে শ্যাক্লটনের নেতৃত্বে এক অভিযাত্রী রওনা হন কুমেরু অভিযানে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য কুমেরুবিন্দুর ১৫০ কিমি দূর থেকেই তাঁদের ফিরে আসতে হয়। অবশ্য এঁরা দক্ষিণ চৌম্বক বিন্দুতে (কুমেরুবিন্দু থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে) নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও পৌঁছতে পেরেছিলেন।

পৃথিবী একটা বিশাল চুম্বকের মতো। এই বিশাল চুম্বকের টানেই কম্পাসের কাঁটা সবসময় উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে। চৌম্বক মেরুরেখা ভৌগোলিক মেরুরেখা থেকে প্রায় ১১° কোণ করে হেলে আছে। চৌম্বক মেরুবিন্দুতে কম্পাসকে খাড়াভাবে ধরলে পৃথিবীর চুম্বকের আকর্ষণের জন্য কম্পাসের কাঁটা তখন লম্বমান। দক্ষিণ চৌম্বক মেরুর অবস্থান ৭২$^{১}/_{২}$° দঃ অক্ষরেখা ও ১৫৫° দ্রাঘিমায়। ১৮৩১ সালে জেমস্ রস উত্তর চৌম্বক মেরুতে প্রথম গিয়েছিলেন। দক্ষিণ চৌম্বক মেরু বিজয়ের ইচ্ছেও তাঁর ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৪১ সালে রওনা হন, কিন্তু প্রচণ্ড বাধার জন্য শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ চৌম্বক বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন না।

নরওয়ের আমুণ্ডসেন ও ব্রিটেনের স্কটের কুমেরু অভিযানের কথা অনেকেরই জানা। ১৯০৯ সালে রবার্ট পিরি সর্বপ্রথম সুমেরুবিন্দু (উত্তর মেরু) পৌঁছতে সমর্থ হন। এর জন্য পিরিকে প্রায় ২০ বছরের ওপর চেষ্টা করতে হয়েছিল। আমুণ্ডসেন প্রথমে সুমেরুবিন্দু বিজয়ের চেষ্টা করার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু পিরির সুমেরুবিন্দু বিজয়ের খবর জানার পর উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে কুমেরুবিন্দু অভিযানে নেমে পড়েন। প্রায় একই সময়ে স্কটও কুমেরুবিন্দু অভিযানের পরিকল্পনা করেন। আমুণ্ডসেন পাঁচজন সঙ্গীসহ সর্বপ্রথম কুমেরুবিন্দুতে পৌঁছলেন ১৪ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে। তিনদিন তাঁরা থাকেন এখানে। আমুণ্ডসেন যখন কুমেরুবিন্দুতে, স্কটের দল তখন প্রায় ৬৫০ কিমি দূরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে এগিয়ে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯১২ সালের ১৭ জানুয়ারি স্কট চার সঙ্গীকে নিয়ে পৌঁছলেন। দেখলেন নরওয়ের পতাকা উড়ছে কুমেরুবিন্দুতে অর্থাৎ আমুণ্ডসেন সেখানে প্রথমে পৌঁছবার কৃতিত্ব অর্জন করে ফেলেছেন। আমুণ্ডসেনের কাছে কুমেরুবিন্দুতে প্রথমে পৌঁছবার প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে স্কট খুব হতাশ হন। ফেরার পথে স্কটের দলকে অনেক দুর্যোগে-দুর্ভোগে পড়তে হয়, ফলে স্কট ও তাঁর চার সঙ্গী পথেই মারা যান। আরও ১৮ কিমি এগিয়ে গেলে তাঁরা

বরফের তলায় পাথুরে জমির সীমারেখা

কুমেরু মহাদেশের পাথুরে জমি (ওয়েসিস)

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!"

—ফেভি ফেয়ারী

চট্‌পট্ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর**।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা--হাতি-বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর**।

বিনামূল্যে, জিম্বো দি জাম্বো কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠান বা এই ঠিকানায় লিখুন: "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

টুকরো কাগজগুলো জমা ক'রে জাম্বো আপনার ঘরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

বিনামূল্যে, জিম্বো দি জাম্বো কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে সে বিষয়ের তথ্যের জন্য এই কুপনটি পাঠান বা এই ঠিকানায় লিখুন:
"ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

নাম :_____

বয়স :_____

ঠিকানা :_____

শহর :_____

রাজ্য :_____ পিনকোড :_____ (A)

আপনি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফ্‌ট্ পত্রিকাটি পেয়েছেন ? হ্যাঁ/না

ফেভিকল এম-আর
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® এইটি আর **ফেভিকল** ব্র্যাণ্ড, এই দুটিই পিডিলাইট ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই-৪০০ ০২১-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

OBM/6379 BN

তাঁদের সরবরাহ ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছতেন এবং হয়তো নিরাপদেই দেশে ফিরে আসতে পারতেন। স্কটের ডায়েরির শেষ পাতায় লেখা আছে, "আমরা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাব, যদিও আমরা দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছি। মনে হচ্ছে সব শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। খুবই দুঃখের ব্যাপার··· কিন্তু আমি আর লিখতে পারছি না।"

১৯১৪ সালে শ্যাকলটন এক নতুন অভিযানের উদ্দেশ্যে কুমেরু মহাদেশে রওনা হন। তিনি ঠিক করলেন কুমেরু মহাদেশকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করবেন। ওয়েডেল সমুদ্রের তীর থেকে রওনা হয়ে কুমেরুবিন্দুতে পৌঁছবেন এবং তারপর রস সমুদ্রের তীরে অভিযান শেষ করবেন। শেষ পর্যন্ত এই অভিযান সফল হয়নি, কিন্তু সাহসিকতার জন্য এই অভিযান পৃথিবীর একটি বিখ্যাত অভিযান হিসেবে পরিচিত। ভিভিয়ান ফুক্স ও এডমণ্ড হিলারি আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিদ্যা বছরে (১৯৫৭-৫৮) শ্যাকলটনের পরিকল্পনামতো কুমেরু মহাদেশকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেন। অবশ্য এঁরা দুটো দলে ভাগ হয়ে যান। ফুক্স ওয়েডেল-সমুদ্রতীর থেকে রওনা হয়ে কুমেরুবিন্দুতে পৌঁছন। হিলারি সরবরাহকারী দল হিসেবে রস-সমুদ্রতীর থেকে রওনা হয়ে ফুক্সের দলের সঙ্গে কুমেরুবিন্দুতে মিলিত হন এবং পরে সমস্ত দলটাই রস-সমুদ্রতীরে ফিরে আসেন। ইদানীংকালের মধ্যে এটা একটা উল্লেখযোগ্য কুমেরু-অভিযান।

কুমেরু মহাদেশে শীতকালীন (মে-জুলাই) তাপমাত্রা –৬৫° সেঃ পর্যন্ত নেমে যায়। পৃথিবীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (–৮৮° সেঃ) কুমেরু মহাদেশের ভস্তোক (সোভিয়েত পর্যবেক্ষণকেন্দ্র) স্টেশনে মাপা হয়েছে। মহাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু অভ্যন্তরে আকাশ মেঘমুক্ত। বৃষ্টি প্রায় কোথাও হয় না। গাছপালা একেবারেই নেই। বাতাস সর্বত্রই অত্যন্ত শুষ্ক। এখানে প্রায়ই তুষারঝড় হয় এবং কখনও-কখনও ১০-১২ দিন ধরে চলে। তুষারঝড়ের সময় বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ২০০-২৫০ কিমি হয়ে থাকে। নরম তুষারকণায় তখন বাতাস পরিব্যাপ্ত হওয়ায় কিছুই দেখা যায় না। হাত বাড়ালে নিজের আঙুলও ঝাপসা লাগে।

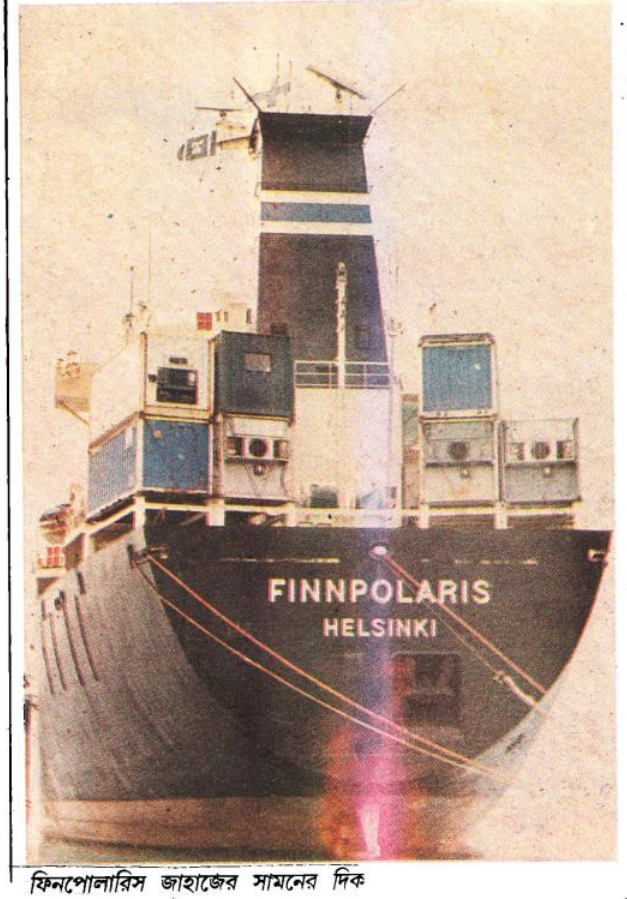

ফিনপোলারিস জাহাজের সামনের দিক

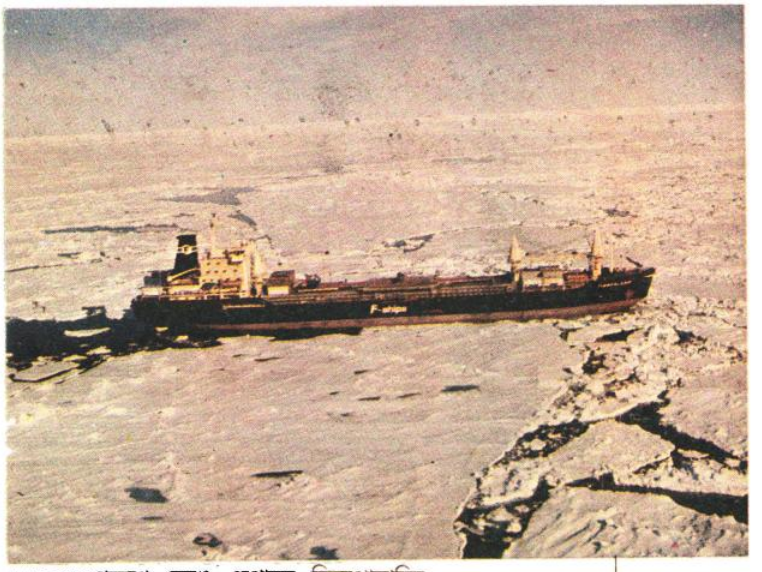
বরফের আস্তরণ ভেঙে এগোচ্ছে ফিনপোলারিস

পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা, শুষ্ক, বাত্যাসঙ্কুল ও দুর্গম। এই মহাদেশ কিন্তু চিরকালই অন্যান্য মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। একসময় ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা কুমেরু মহাদেশের লাগোয়া প্রতিবেশী ভূখণ্ড ছিল। এই সমস্ত মহাদেশের অবিচ্ছিন্ন অংশকে বলা হয় গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। প্রায় ১৫-২০ কোটি বছর আগে এই বিশাল অবিচ্ছিন্ন মহাদেশ ধীরে ধীরে ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে যায় এবং পরস্পর থেকে দূরে সরতে থাকে। এই সঞ্চরমাণ মহাদেশের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে তৈরি হয় নতুন ভূত্বক ও সমুদ্র। অন্যান্য মহাদেশগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অনেকদূর সরে গেছে। তবে তুলনামূলকভাবে কুমেরু মহাদেশ অনেক কম সরেছে। অবশ্য কুমেরু মহাদেশ থেকে অন্যান্য মহাদেশগুলো একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়নি। ক্রমে-ক্রমে মহাদেশগুলি এক-এক করে ছিন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশটি কুমেরু মহাদেশ হিসেবে রয়ে গেছে।

ভারতের ২১ জন অভিযাত্রী ৯ জানুয়ারি ১৯৮২ সালে ভারতীয় সময় সকাল তিনটেয় সর্বপ্রথম কুমেরু মহাদেশে পদার্পণ করেন। পরবর্তী দু'বছরে আরও দুটি অভিযান বেশ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তৃতীয় অভিযানে ভারত সর্বপ্রথম একটি স্থায়ী পর্যবেক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে। বরফের পাটাতনের ওপর এই কেন্দ্রের নামকরণ হয় 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী'। এখানে তৃতীয় অভিযানের ১২ জন সদস্য এক বছরের জন্যে

থেকে যান। এঁরাই হলেন কুমেরু মহাদেশে ভারতের প্রথম শীতকালীন দল।

চতুর্থ অভিযানে আমাকে দলনেতা হিসেবে মনোনীত করা হয়। অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে দলের সদস্যেরা জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশের কারগিলের কাছে মাচোই হিমবাহে প্রায় সপ্তাহখানেকের জন্যে অনুশীলন করেন। উদ্দেশ্য ছিল দলের সদস্যদের বরফ ও হিমবাহের পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এর আগে অবশ্য প্রত্যেক সদস্যকেই ডাক্তারেরা শারীরিক পরীক্ষা করে দেখেন। এ ছাড়া নেতা, দুই সহনেতা ও শীতকালীন সদস্যদের মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও করা হয় মনোবল ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য। আমাদের দলে ছিলেন ২৮ জন ভারতীয় সেনাবাহিনীর, ১৭ জন নৌ-বাহিনীর ও ১৩ জন বায়ুসেনার লোক। নৌ-বাহিনী ও সেনা-বাহিনীর দলের মধ্যে চারজন রাঁধুনিও ছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন চারজন ডাক্তার। বাদবাকি সবাই বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিবিদ। সঙ্গে ছিল চারটি হেলিকপ্টার—বায়ুসেনার দুটি বড় ও নৌ-বাহিনীর দুটি ছোট হেলিকপ্টার। বরফে চলাফেরা ও স্লেজ টানার জন্য স্নো ভেহিকেল্‌স ও স্নো স্কুটার। বরফ কাটার জন্য ছিল স্নো-কাটার। ভারী মালপত্র তোলার জন্য একটা বড় ক্রেনও ছিল আমাদের সঙ্গে। এ ছাড়া ছিল চাল, ডাল, আটা, মাছ, মাংস, আলু, পেঁয়াজ, টিনের খাবার, জ্বালানি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর তৈরি করার সামগ্রী, বেশভূষা ইত্যাদি। এককথায় ছুঁচ থেকে হেলিকপ্টার—সবই ছিল। কুমেরু মহাদেশে কাজের সময় কোনও জিনিসের দরকার পড়লে জিনিসটি তৈরি করে নেওয়াও সম্ভব হবে না কিংবা অন্য কোথাও থেকে আনিয়ে নেওয়াও যাবে না। আমাদের কাজের জায়গা থেকে নিকটতম দেশ কয়েক হাজার কিমি দূরে। অতএব সব কিছুই হিসেব করে গুছিয়ে ভারত থেকেই নিয়ে যেতে হবে। দরকারি জিনিস ভুল করে না নিয়ে গেলে বা অগোছালোভাবে নিয়ে গেলে অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেখানে বরফ গলিয়ে জল তৈরি করতে হয়। বাইরে কাজের সময় বরফ গলানো সবসময় সম্ভব নয়। এই ঠাণ্ডা মহাদেশ শুষ্কতম বলে কাজের সময় তেষ্টাও পায়। আমরা এর জন্যেও তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। বিভিন্ন রকমের বোতলের পানীয় (soft drink) প্রায় এক লক্ষের মতো আমাদের সঙ্গে ছিল। কাজের সময় তেষ্টা পেলেই আমরা এই পানীয় ব্যবহার করতাম। কয়েক হাজার চকোলেটও নিয়ে গিয়েছিলাম। কাজের সময় খিদে পেলে বা দুর্বল লাগলেই পকেট থেকে কয়েক টুকরো চকোলেট মুখে ফেলে দিতাম।

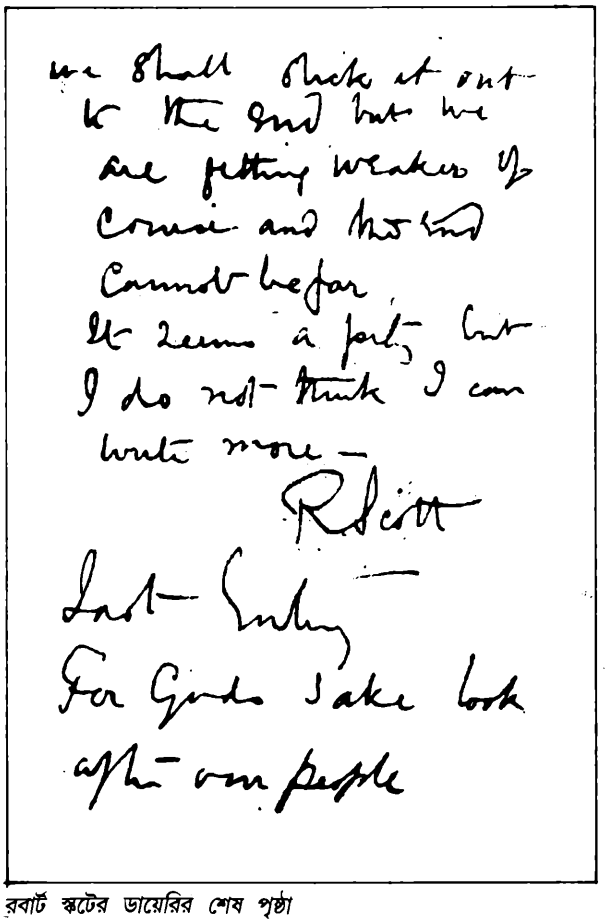

রবার্ট স্কটের ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠা

এইসব লটবহর বোঝাই করে ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪ সালে ৮২ জন সদস্য মিলে আমরা ফিনদেশীয় মালবাহী জাহাজ 'ফিন পোলারিস'-এ গোয়া থেকে রওনা হই। জাহাজে মালপত্র বোঝাই করতে গোয়ায় আমরা প্রায় সপ্তাহখানেক সময় নিই। জাহাজ কুমেরু মহাদেশে নোঙর করার পর সমস্ত মালপত্র জাহাজ থেকে সরাসরি কাজের জায়গায় আমাদেরই বয়ে নিয়ে যেতে হবে। কুমেরু মহাদেশে বাড়ি তৈরি করার কাজে সবচেয়ে আগে লাগবে ভিত, পরে দরকার হবে বাড়ির ছাদ। অতএব গোয়ায় জাহাজে মালপত্র এমন ভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে যে, ছাদের সরঞ্জাম থাকবে সবচেয়ে নীচে ও ভিতের সরঞ্জাম থাকবে ওপরে। যদি একাধিক বাড়ি তৈরি করতে হয়, তা হলে মালপত্র বিভিন্ন রঙে চিহ্নিত করে দেওয়াই ভাল। রঙ দেখেই বোঝা যাবে, কী কাজের জন্য এই মালপত্র আনা হয়েছে। খোঁজাখুঁজিতে অযথা সময় নষ্ট করতে হবে না। জাহাজের ডেকে কোনও জিনিস রাখা চলে না। জাহাজ সমুদ্রে খুব দোলে এবং ডেকের জিনিস ছিটকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য বিশেষ ধরনের কনটেনারে জাহাজের ওপরে বিশেষ কিছু জায়গায় জিনিসপত্র রাখা যেতে পারে। হেলিকপ্টার কুমেরু মহাদেশে জাহাজের ডেকের ওপর থেকেই উড়বে, বাকি সময়টায় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডেকের ওপরই থাকবে, অতএব ডেকের বেশির ভাগ জায়গা ফাঁকা রাখতেই হবে।

আমাদের হাতে কাজের সময় খুবই অল্প। কুমেরু মহাদেশে থাকব প্রায় দু'মাসের মতো, যার মধ্যে ১৫-২০ দিন তুষারঝড়ের জন্য বাইরে কাজ করা আদৌ সম্ভব নয়। তার মানে কাজ করার জন্য হাতে সময় পাব ৪০-৪৫ দিন। সমস্ত মালপত্র ভালভাবে গুছিয়ে জাহাজে রাখার পর চারটে হেলিকপ্টারকে জাহাজের ভেতরে রেখে দেওয়া হয়। ডেকের ওপর রাখার অসুবিধের কথা আগেই বলেছি। তা ছাড়া কোনও যন্ত্রপাতিই সমুদ্রযাত্রায় বাইরে রাখা নিরাপদ নয়। সমুদ্রযাত্রায় নোনা আবহাওয়ায় যন্ত্রপাতির ক্ষয় বেশি হয়, তাই সমুদ্রে যাতায়াতের সময়টা হেলিকপ্টার ইত্যাদি জাহাজের ভেতরে রাখাই সমীচীন। যাই হোক, ৮২ জন সদস্য, হেলিকপ্টার, বরফের ওপর চলাফেরার উপযোগী গাড়ি,

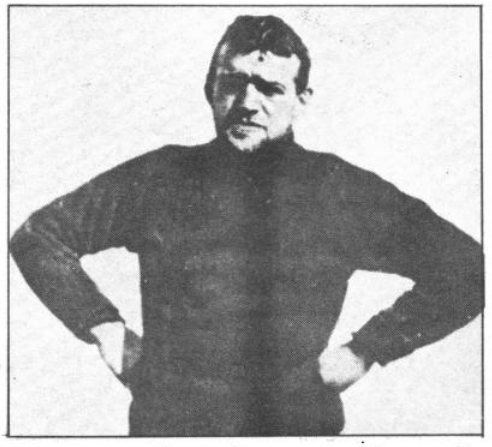

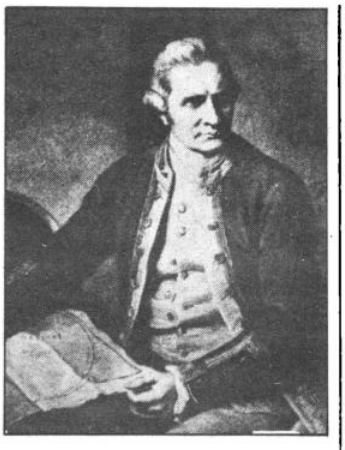

তিন মেরু-অভিযাত্রী। (বাঁদিক থেকে) আর্নেস্ট শ্যাকলটন, রবার্ট স্কট ও জেমস কুক

১০০০ টনের ওপরে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি নিয়ে ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সালে ভোর ৬টায় চমৎকার আবহাওয়ায় আমরা গোয়া থেকে রওনা হলাম। সেনা ও নৌ-বাহিনী ব্যাণ্ড বাজিয়ে আমাদের বিদায় জানালেন।

যেতে হবে প্রায় ১৫০০০ কিমি দূরে। গোয়া থেকে প্রথমে মরিশাস দ্বীপে এবং সেখান থেকে কুমেরু মহাদেশের ৭০° দঃ অক্ষরেখা ও ১১° পূঃ দ্রাঘিমা-বিন্দুতে। সময় লাগবে তিন সপ্তাহের মতো। মরিশাস দ্বীপে তিনজন বিদেশী সদস্য আমাদের দলে যোগ দিলেন। একজন মরিশাসের বৈজ্ঞানিক ও দুজন পশ্চিম জার্মানির প্রযুক্তিবিদ। সবসুদ্ধ আমাদের দলে এখন ৮৫ জন। এ ছাড়া আছেন জাহাজের ২৫ জন নাবিক। জাহাজের মোট ওজন বইবার ক্ষমতা ১২০০০ মেট্রিক টন। এটি লম্বায় প্রায় ১৬০ মিঃ। এই জাহাজটি আইসক্লাস (Ice-class), আইস-কাটার (Ice-cutter) নয়। এরকম জাহাজ ৭০ সেঃ মিঃ পুরু বরফের চাদরকে ধাক্কা মেরে ভেঙে এগিয়ে যেতে পারে। আইসব্রেকার জাহাজের ক্ষমতা কিন্তু এর চেয়েও বেশি। আইসব্রেকার জাহাজ বরফের চাদরের ওপর উঠে বসতে পারে এবং জাহাজের ওজনে বরফের পুরু চাদরও ভেঙে যায়। অবশ্য আইসব্রেকার জাহাজের দামও অনেক বেশি। ফিন্ পোলারিসে আছে ছয় সিলিণ্ডারের ইঞ্জিন, যার ক্ষমতা প্রায় ১০,০০০ হর্স পাওয়ারের মতো। এই জাহাজ চালাতে প্রতিদিন প্রায় ৩০ টনের মতো জ্বালানি খরচ হয়। জাহাজের গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫ নটিকাল মাইল বা ২৭ কিমি। গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ কিমি বা ৫° অক্ষরেখা অতিক্রম করতাম। জাহাজের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ব্রিজ (Bridge)। আধুনিক জাহাজ কম্পিউটারের সাহায্যে চলে। যাত্রাপথ নির্ণয় করে সেইভাবে প্রোগ্রাম করে কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জাহাজ চলতে থাকে। অবশ্য বন্দরে বা যেখানে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে যেতে হবে সেখানে নাবিকরা নিজেরাই জাহাজ চালনা করেন। সমুদ্রে জাহাজের অবস্থিতি নির্ণয় করার জন্য আজকাল স্যাটেলাইটের সাহায্য নেওয়া হয়। ব্রিজে রাডার যন্ত্রও থাকে এবং এর সাহায্যে সামনের অদৃশ্য জাহাজ, দ্বীপ বা হিমশৈল ইত্যাদির অস্তিত্ব চোখে দেখার আগেই টের পাওয়া যায়। এ ছাড়া আবহাওয়া স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন আবহাওয়াকেন্দ্র থেকে জাহাজে আবহাওয়ার বিভিন্ন তথ্যও সংগ্রহ করা হয়। জাহাজ থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ফোন ও টেলেক্স করাও সম্ভব।

জাহাজের পেছনের দিককে 'স্টার্ন' (Stern), সামনের দিককে (bow), বাঁ পাশের দিককে (port) ও ডান দিককে 'স্টার বোর্ড' (Starboard) বলা হয়। নাবিকরা এই শব্দগুলোকেই ব্যবহার করে থাকেন।

গোয়া থেকে রওনা হওয়ার পর জাহাজ আরব সাগরের তুঁতেরঙের জলে ভেসে চলেছে। আমরা কয়েকজন জাহাজের ডেকে ঘোরাফেরা করছি। জাহাজের এক কোনায় একটা চড়ুইপাখিও আমাদের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে। মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক ফুড়ুত-ফুড়ুত করে উড়ে যাচ্ছে, আবার বসে পড়ছে। জাহাজ থেকে খুব দূরে যাওয়ার সাহস নেই। আমাদের হাতে এখন গল্পগুজব করার অঢেল সময়, অতএব আমরা এই চড়ুইকে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম। কুমেরু মহাদেশ পর্যন্ত এই চড়ুই নিরাপদে যেতে পারবে কি না এই নিয়ে কিছু তর্ক-বিতর্কও হল। যাই হোক, ঠিক হল, চড়ুইয়ের জন্য নিয়মিত খাবার ও জলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং চড়ুইপাখিই ঠিক করুক ও কতদূর যাবে। আরব সাগর পেরিয়ে এবার আমরা ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়লাম। দিন-চারেক পর আমরা পার হলাম বিষুবরেখা। চড়ুইপাখিও আমাদের সঙ্গে বিষুবরেখা পার হল। বিষুবরেখা অতিক্রম করা নাবিকদের কাছে একটা স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের দলের অনেকেই এবং কয়েকজন নাবিকও জীবনে এই প্রথম বিষুবরেখা অতিক্রম করলেন। ছ'দিন পর পৌঁছলাম ছোট্ট, সুন্দর দ্বীপ মরিশাসে। মরিশাসকে সামুদ্রিক ঝড়ের ও আখের দ্বীপও (Island of hurricane and sugarcane) বলা হয়। এখানে খুব ঘন ঘন ইন্দ্রধনুও দেখতে পাওয়া যায়। মরিশাস লম্বায় ৬০ কিমি ও চওড়ায় প্রায় ৪০ কিমি। প্রায় দশ লক্ষ লোক বাস করে এই দ্বীপে। বেশির ভাগ লোকই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। প্রায় ১৫০ বছর আগে আখের চাষ করতে এই ভারতীয়দের আনা হয়েছিল। অনেকেই হিন্দি বা ভোজপুরী বুঝতে পারেন। মরিশাস দ্বীপে তিন দিন থেকে আমরা কুমেরু মহাদেশের দিকে রওনা হলাম। চড়ুইপাখির সমুদ্রযাত্রা ভাল লাগেনি। মরিশাস দ্বীপের গাছপালা দেখে তার আর জাহাজে থাকতে ইচ্ছে করেনি। কখন জাহাজ ছেড়ে সে চলে গেছে আমরা জানতেও পারিনি। চড়ুইপাখির সঙ্গে

হেলিকপ্টারে মাল পরিবহণের দৃশ্য

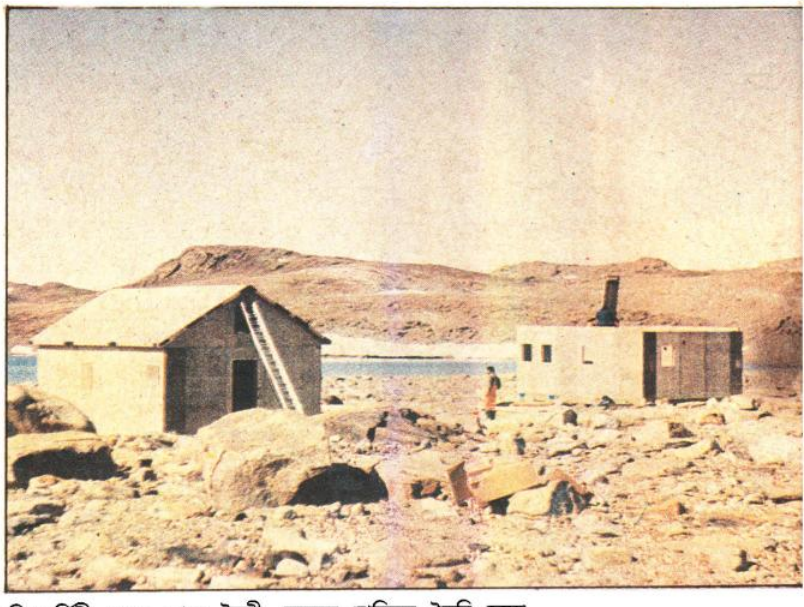

প্রিয়দর্শিনী হ্রদের কাছে মৈত্রী কেন্দ্রের বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে

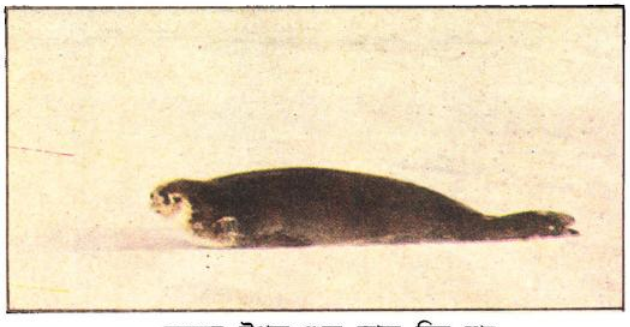

বরফের উপরে শুয়ে আছে সিল মাছ

জমাট বরফের ফাটল পরীক্ষা করা হচ্ছে। সামনে স্নো-স্কুটার

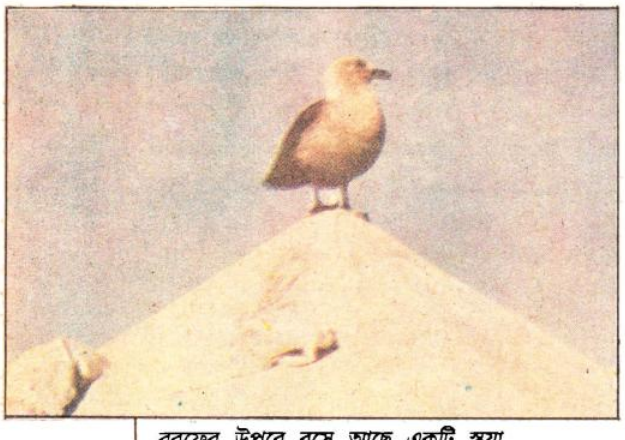

বরফের উপরে বসে আছে একটি স্কুয়া

আমাদের বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। চলে যাওয়ায় আমাদের মনটা খারাপ হয়ে যায়। দু'সপ্তাহ পরে আমরা এসে পৌঁছলাম ৪০° দঃ অক্ষরেখার কাছাকাছি। সমুদ্র ৪০° দঃ অক্ষরেখা থেকে ৬০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত খুব উত্তাল থাকে। নাবিকরা এই জায়গাটার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। যেমন ৪০° দঃ অক্ষরেখার সমুদ্রকে বলা হয় গর্জনকারী চল্লিশা (Roaring forties), ৫০° দঃ অক্ষরেখার সমুদ্রভাগকে বলা হয় আর্তনাদকারী বা Screaming fifties এবং ৬০° দঃ অক্ষরেখার সমুদ্রভাগকে বলা হয় বিলাপকারী বা Howling sixties। এই অঞ্চলে কিছু বিশেষ ধরনের পাখিও পাওয়া যায়। পাখিরা জাহাজের কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায় খাবারের খোঁজে, যদিও সমুদ্রের মাছ ও স্কুইড (Squid)-ই এদের খাদ্য। এই এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় পেট্রেল, অ্যালবাট্রস পাখি। অ্যালবাট্রস পাখির বাতাসে ভেসে যাওয়া দেখার মতন। অ্যালবাট্রস সবচেয়ে বড় উড়ন্ত সামুদ্রিক পাখি। এদের ডানা খুব সরু ও প্রায় সাড়ে-তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। দক্ষিণ সমুদ্রের অ্যালবাট্রসকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) সাদা রঙের খুব বড় ওয়াণ্ডারিং ও রয়্যাল অ্যালবাট্রস, (২) ধূসর রঙের মলিমকস (Mollymauks) অ্যালবাট্রস। এদের লেজ ছোট ও গোলাকৃতি, (৩) সুটি (Sooty) অ্যালবাট্রস। এদের লেজ কিন্তু লম্বা ও ত্রিভুজাকৃতি। অ্যালবাট্রসরা উচ্চগতিসম্পন্ন হাওয়ার বেগের ওপর নির্ভর করে স্বচ্ছন্দে আকাশে ওড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একবারও ডানা না নেড়ে বাতাসে এরা চমৎকার ভাবে ভেসে যায়। সাধারণত কোনও নির্জন দ্বীপে ঘাস, কাদা ইত্যাদি দিয়ে কোণাকৃতি বাসায় এরা সাদা রঙের একটা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটতে প্রায় তিন মাসের মতো সময় লাগে। বাচ্চা অ্যালবাট্রস কয়েক মাস বাসায় থাকার পর বাইরে বেরিয়ে আসে। বলা

হয়, অ্যালবাট্রসরা বছরে অন্তত একবার সারা পৃথিবী পরিক্রমা করে ফেলে। এদের ওড়ার গতি দিনে প্রায় ৫০০ কিমি। নাবিকদের ধারণা, অ্যালবাট্রস শিকার করলে জাহাজকে নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়তে হয়। কোলরিজের 'রাইম অব অ্যানসিয়েন্ট মেরিনার' কবিতায় অ্যালবাট্রস মারার পর নাবিকদের দুর্ভোগের গল্প বলা হয়েছে।

অ্যালবাট্রস ছাড়াও এই অঞ্চলে পেট্রেল পাখিও প্রায় দেখা যায়। এরা কিন্তু অ্যালবাট্রসদের মতো ভেসে বেড়াতে পারে না। সাধারণ পাখিদের মতোই পেট্রেলদের উড়াল। কিন্তু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা উড়তে উড়তে নীচে নেমে চমকপ্রদভাবে জল ছুঁয়ে আবার উড়ে যায়। ওড়ার এই বৈশিষ্ট্য দেখার মতো। এই অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের পেট্রেল পাওয়া যায়। যথা : জায়েন্ট, স্টর্ম, স্নো পেট্রেল ইত্যাদি। স্নো পেট্রেল ধবধবে সাদা রঙের পাখি। এ ছাড়াও দেখতে পাওয়া যায় কেপ পিজিয়ন (Cape Pigeon) ও প্রায়ন (Prion)। নাম থেকেই বোঝা যায় যে কেপ পিজিয়নস অনেকটা আমাদের দেশের পায়রার মতো। ডানাগুলো কালো-সাদায় মেশানো। সাধারণত ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়। এ ছাড়াও এ অঞ্চলে পাওয়া যায় বিশেষ ধরনের স্টার্ন পাখি—সুটি ও অ্যান্টার্কটিক স্টার্ন।

কুমেরু মহাদশেকে ঘিরে যে দক্ষিণ মহাসাগর, সেখানে বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুচো চিংড়ির মতো একজাতীয় মাছ যার নাম ক্রিল। ক্রিল প্রোটিনসমৃদ্ধ এবং এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এত বেশি যে সমুদ্রের জলের রঙটাই এরা পালটে দেয়। একটা বড় মাপের ক্রিল মাছ লম্বায় প্রায় সাড়ে-চার সেঃ মিঃ আর ওজনে এক গ্রামের একটু বেশি। জাপান, সোভিয়েত দেশ ও পোল্যাণ্ড নিয়মিত ভাবে এই অঞ্চল থেকে বহুল পরিমাণে ক্রিল মাছ ধরার কৌশল রপ্ত করেছে।

এ ছাড়া এই অঞ্চলে তিমিমাছও পাওয়া যায়। তিমি খুবই বুদ্ধিমান প্রাণী। এরা কোটি কোটি বছর আগে স্থলভাগ ছেড়ে সমুদ্রে চলে আসে। সমুদ্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এখনও ভালভাবেই বেঁচে আছে। একসময়ে তিমিরা চতুষ্পদ প্রাণী ছিল, কিন্তু এখন পেছনের পা-দুটি আর নেই। চ্যাপটা লেজ ও সামনের পা-দুটোর সাহায্যে বেশ দ্রুতগতিতেই এরা জলে সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে পারে। তিমিরা দীর্ঘজীবী। এদের আয়ু ৭৫ থেকে ১০০ বছর। তিমির নানান প্রজাতি, যথা স্পার্ম (Sperm), মিন্‌ক(Minke), ফিন (Fin), সি (Sei) ব্লু (Blue) ও হাম্পব্যাক (Humpback) তিমি। ব্লু বা নীলতিমি পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী। এরা লম্বায় ২০-৩০ মিটার ও ওজনে ১৫০ টনের কাছাকাছি। প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ডায়নোসরের চেয়েও নীলতিমি বড়। এদের খাদ্য মুখ্যত ক্রিল মাছ। কিছু তিমি আবার দাঁতালো, যেমন স্পার্ম তিমি। এদের ২৬টা শক্ত খুঁটির মতো দাঁত থাকে নীচের মাড়িতে। ওপরের মাড়িতে কিন্তু কোনও দাঁতই নেই। এই স্পার্ম তিমিকে নিয়ে হেরম্যান মেলভিন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মবি ডিক' লেখেন। দাঁতালো তিমি শিকারের খোঁজে সমুদ্রের অনেক নীচে নেমে যায়। এরা শিকারের জন্যে বিভিন্ন শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করে এবং এই শব্দতরঙ্গের সাহায্যে অন্যান্য তিমিদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখে।

ফিন পোলারিস জাহাজ সমুদ্রে এগিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের দোলায় অভিযাত্রীরা কেউই অসুস্থ হয়ে পড়েননি এখনও। অল্প অল্প ভাসমান বরফ চোখে পড়তে লাগল ৬৫° দঃ অক্ষরেখা অতিক্রম করার পর। এরপর জাহাজ যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই বরফের প্রতিরোধ বাড়তে থাকে। ফিন পোলারিসের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া ক্রমশই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। জাহাজ স্থান পরিবর্তন করতে থাকে এমন কোনও জায়গার খোঁজে যেখানে বরফের প্রতিরোধ কম। এ-রকম ক্ষেত্রে অবস্থা অনেক সময়ে খুব ঘোরালো হয়ে ওঠে। কয়েক বছর আগে পশ্চিম জার্মানির কুমেরু অভিযানের জাহাজ এই জমাট বরফে আটকা পড়ে যায়। জার্মানি অবশ্য দুটো জাহাজ পাঠিয়েছিল। তাই আটকা-পড়া জাহাজ থেকে অভিযাত্রীদের অন্য জাহাজে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অভিযানটিকে বন্ধ করে দিতে হয়। জিনিসপত্রের ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রচুর। ভারতীয় অভিযানে কেবল একটাই জাহাজ। আমরা বরফে আটকা পড়লে অভিযাত্রীদের শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের নীচে চলে যেতে হবে। অতএব আমাদের জাহাজ খুব সাবধানে এগোতে থাকে। আমাদের গন্তব্যস্থল পলিনিয়া (Polynya)। কুমেরু মহাদেশের কাছাকাছি গ্রীষ্মকালে জমাট বরফের মধ্যে এক বিশাল অঞ্চলে সমুদ্র উন্মুক্ত থাকে। এই উন্মুক্ত অঞ্চলকে বলে পলিনিয়া। স্থান পরিবর্তন করতে করতে বরফ-বাধা কাটিয়ে অনেক দুর্ভাবনার পর আমরা পলিনিয়ায় পৌঁছলাম। জমাট বরফের প্রতিরোধের জন্য কুমেরু মহাদেশ পৌঁছতে নির্ধারিত সময় থেকে তিন-চার দিন দেরি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ২৮ ডিসেম্বর সকালে পলিনিয়ায় পৌঁছেই এবং বিকেলে (ভারতীয় সময় প্রায় রাত দশটায়) কুমেরু মহাদেশের উপকূল থেকে প্রায় ৫০-৬০ কিমি দূরে সমুদ্রের জল-জমা বরফের ওপর জাহাজ নোঙর করে।

এই বরফ গ্রীষ্মকালে ক্রমে টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। ফেব্রুয়ারি মাসে একেবারে উপকূল পর্যন্ত সমুদ্র উন্মুক্ত হয়ে যায়। কুমেরু মহাদেশের তট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০-২৫ মিটার উঁচু। এই উচ্চতা থেকেই অনুমান করা সম্ভব যে, একটা জায়গা কুমেরু মহাদেশের তীরবর্তী অঞ্চলে, না পার্শ্ববর্তী সমুদ্র অঞ্চলে। এই অঞ্চলে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই বরফ বলে এই উচ্চতা ছাড়া আর অন্য কোনওভাবেই এ-সম্বন্ধে অনুমান করা সম্ভব নয়। গ্রীষ্মকালে সমুদ্র-জমা তুষার-রাজ্যের আয়তন অনেক কমে যাওয়ায় পৃথিবীর যে-কোনও কুমেরু-অভিযানই ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে কুমেরু মহাদেশে পৌঁছবার চেষ্টা করে। ভারতীয় অভিযানও এই একই কারণে ডিসেম্বরের প্রথমে রওনা হয় ভারত থেকে এবং ডিসেম্বরের শেষে কুমেরু মহাদেশে পৌঁছয়। মার্চের মাঝামাঝি সমুদ্রের জল আবার জমতে শুরু করে এবং সমুদ্র জমাট-বাঁধার আগেই জাহাজকে কুমেরু মহাদেশ থেকে রওনা হতে হয়। শীতকালে সমুদ্র-জমা বরফের সীমা ৬০° দঃ অক্ষরেখা পর্যন্ত এগিয়ে আসে। শীতকালে জমা বরফের এই প্রতিরোধ অতিক্রম করে কোনও অভিযানই কুমেরু মহাদেশে যেতে পারে না।

চতুর্থ ভারতীয় অভিযানে মালপত্র অনেক বেশি ছিল, কাজও ছিল একাধিক জায়গায়। হাতে সময় খুবই অল্প।

অভিযানকে সফল করার জন্য মালপত্র সঠিকভাবে দরকারের সময় কাজের জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। তৃতীয় অভিযান পর্যন্ত ভারতীয় দল কেবল হেলিকপ্টারের মাধ্যমেই মালপত্র সরবরাহ করে এসেছে। জমাট সমুদ্রের ওপর স্লেজ দিয়ে মালপত্র বহন এর আগে কখনও করা হয়নি। মালপত্র বেশি থাকায় আমরা ঠিক করলাম স্লেজে করে জমাট সমুদ্রের ওপর দিয়েও মাল পরিবহণ করা হবে এবার। জমাট সমুদ্রের ওপর এ-কাজটি মোটেই নিরাপদ নয়। অন্যান্য দেশের অভিযান এইভাবে মাল পরিবহণ করতে গিয়ে কখনও-কখনও মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। জমাট সমুদ্রে মাল পরিবহণ করার অভিজ্ঞতা ভারতীয় দলের একেবারেই নেই। তবুও অভিযানের স্বার্থে আমরা এই ঝুঁকি নিতে মনস্থ করি। দরকার পড়লে ঝুঁকি নেওয়ার দুঃসাহস কুমেরু-অভিযাত্রীদের দেখাতেই হবে। আমরা কয়েকজন প্রথমেই জমাট সমুদ্রের বরফ নিরীক্ষণ করে এলাম। উদ্দেশ্য, স্লেজে করে ১০-১২ টন মালপত্র এই জমাট বরফের ওপর নিরাপদে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না দেখা। এই জমাট বরফের এখানে-ওখানে বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয় যা কোনও কোনও স্থানে ওপর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু অনেক জায়গাতেই এই ফাটল নরম বরফে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় ওপর থেকে একেবারেই বোঝা যায় না। সেইসব ফাটলে স্লেজ পড়ে গেলে লোকজন, মালপত্রসমেত তিন-চার মিটার নীচে সমুদ্রের জলে একেবারে সলিল-সমাধি।

আমাদের হাতে সময় অল্প হলেও কাজের দিক দিয়ে কিন্তু একটা সুবিধে ছিল। আমরা যখন কুমেরু মহাদেশে পৌঁছই তখন ২৪ ঘণ্টাই দিন (Polar Day)। অতএব প্রতিদিন এক নাগাড়ে ১৪-১৬ ঘণ্টা কাজ করা সম্ভব। এইভাবেই ৪০-৪৫ কাজের দিনের মধ্যেই আমরা সব কাজ করে ফেলতে পারি।

কাজ শুরু করার পরই আমরা কতগুলো বিপদে পড়ি। প্রথম বিপদ দেখা দেয়, ৩০ ডিসেম্বর সকালে। আগের দিন রাতে 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী'তে মালপত্র নামিয়ে তিনটে স্লেজ ফিরে আসে রাত প্রায় দশটায়। রাতে আমরা ছোট হেলিকপ্টারকে জমাট বরফের ওপর নামিয়ে রাখি, কারণ, বিমানবাহিনীর বড় হেলিকপ্টারটা জাহাজের ভেতর থেকে ডেকে উঠিয়ে আনতে হবে। ডেকের অল্প পরিসরে একই সময়ে একটা বড় ও একটা ছোট হেলিকপ্টার রাখা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে দুটো হেলিকপ্টার ব্যবহার করব বলেই এই ব্যবস্থা। ডেকে জায়গার অভাবে চারটে হেলিকপ্টারই একই সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। স্থির হয়, রাতে স্লেজের চালকরা বিশ্রাম নেবে জাহাজে এবং সকালে স্লেজে মালপত্র তুলে গন্তব্যস্থলে রওনা হবে। সকালে মালপত্র বোঝাই করে স্লেজ যখন প্রায় রওনা হবার মুখে তখন জমাট বরফের ওপর লম্বা-লম্বা হালকা রেখা দেখা যায়। নিমেষের মধ্যে এই রেখা থেকে ফাটল সৃষ্টি হতে থাকে। এই সময়ে জমাট বরফে প্রায় ২০-২৫ জন সদস্য ঘোরাফেরা করছিলেন। কেউই জমাট বরফের এই খামখেয়ালিপনার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আমরা সঙ্গে-সঙ্গে মাইক্রোফোনে ঘোষণা করি স্লেজকে অতি সত্বর এগিয়ে যেতে এবং অন্যান্য সদস্যদের জমাট বরফ থেকে জাহাজে ফিরে আসতে। জাহাজ নোঙর খুলে নিরাপত্তার জন্য সমুদ্রে সরে যাবে। তাড়াতাড়ি সরে না গেলে বিচ্ছিন্ন বরফের বড়-বড় টুকরো জাহাজকে ধাক্কা মেরে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ফাটল নিমেষের মধ্যে এত চওড়া হয়ে যায় যে, অনেককেই লম্বা দৌড় দিয়ে এসে প্রায় লংজাম্প দিয়ে কোনওক্রমে ফাটল অতিক্রম করতে হয়। সুন্দর কাজের পরিস্থিতি দেখতে-দেখতে আতঙ্কের পরিস্থিতিতে পরিণত হল। অন্যদিকে স্লেজ মালপত্র নিয়ে এগোচ্ছে বটে, কিন্তু সারি-সারি লম্বা লম্বা ফাটল তাকে অনুসরণ করছে। অনুসরণ না বলে ধাওয়া করছে বলাই বোধহয় ঠিক হবে। আমরা স্লেজের চালকদের সঙ্গে ওয়াকিটকি মারফত যোগাযোগ রাখছি। বলছি, তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যাও। যদিও আমরা চালকদের অভয় দিচ্ছিলাম, তবু আমাদের ভয় ছিল যে, পেছনের মতো সামনেও যদি ফাটল দেখা দেয়, তা হলে স্লেজ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে। সামনের ফাটলের জন্য যদি না এগোয় তা হলে ভাসমান জমাট বরফের ওপর আটকা পড়ে যাবে। সেই ভাসমান বরফের টুকরোও ক্রমে ছোট-ছোট টুকরোয় পরিণত হবে এবং স্লেজ সবসুদ্ধ জলে ডুবে যাবে। আমরা হেলিকপ্টারকে তৈরি থাকতে বলি যে-কোনও অবস্থার মোকাবিলার জন্য। দরকার পড়লে ছোট্ট ভাসমান বরফের টুকরোর ওপরেই হেলিকপ্টারকে নামতে হবে অন্তত চালকদের নিরাপদে জাহাজে তুলে আনার জন্য। যাই হোক, সামনে ফাটল না-থাকায় স্লেজ এগিয়ে চলে। দু-তিন ঘণ্টার উদ্বেগের পর আমরা নিরাপদ বোধ করি। ততক্ষণে স্লেজ বরফের পাটাতনের অনেক ভেতরে চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত সেদিন স্লেজ নিরাপদেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছেছিল। আমরা অবশ্য এই ঘটনার জন্য স্লেজে মালবহন করা বন্ধ করিনি। অভিযানে ভয় পেলে চলে না, সতর্কতা অবশ্য সবসময়েই দরকার। বাধা-বিপত্তি অভিযানে মাঝে-মাঝে আসবেই, তার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে। এর পরে আমরা অবশ্য জাহাজ থেকে নীচে নামার জন্য সিঁড়ি একেবারেই নামাইনি। নীচে আসতাম ক্রেন থেকে ঝোলানো একটা বাকেটে চেপে। নীচে যাদের কাজ নেই তাদের পেঙ্গুইন, সিল ইত্যাদির ফোটো তোলার জন্য যখন-তখন জাহাজ থেকে নীচে নেমে যাওয়ার অভ্যেসটাকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছিল।

বরফের এই মরুভূমিতে কাজ শুরু করার পর কুমেরু মহাদেশের প্রাণিজগতের সঙ্গেও একটু-একটু করে পরিচয় শুরু হল। প্রথমেই বলতে হয় পেঙ্গুইনের কথা। এরা উড়তে পারে না। পেঙ্গুইনদের হাবভাব এমনই যে সহজেই এরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৃথিবীর কোনও পাখিই এদের কাজকর্মের সঙ্গে পেরে উঠবে না। ঠাণ্ডায় বাঁচার জন্যে এদের শরীরে বেশ পুরু চর্বি আছে এবং শরীরের প্রায় সবটাই ছোট-ছোট শক্ত পালকে ঢাকা—অনেকটা মাছের আঁশের মতন। এরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে থেকে কীভাবে ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে বাঁচতে হয় সেটা ভালভাবেই রপ্ত করে ফেলেছে। যে-কোনও পাখির চেয়ে এরা জলে বাঁচার প্রক্রিয়া ভালভাবেই জানে। এরা যেমন চমৎকার সাঁতার কাটে তেমনই মাছশিকারেও সিদ্ধচঞ্চু। এরা দুটো ডানার সাহায্যে ঘণ্টায় ৩০ কিমি বেগে সাঁতার কাটতে পারে। এই ডানার সাহায্যে এরা জল থেকে দু'মিটার উঁচু লাফ দিতেও পারে। এদের খাদ্য সমুদ্রের ক্রিল ও স্কুইড জাতীয় মাছ। সেজন্যই এরা কুমেরু মহাদেশে তীরবর্তী অঞ্চলেই থাকে, খুব ভেতরে যায় না। নানা জাতের পেঙ্গুইন কুমেরু মহাদেশে দেখতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে ছোট পেঙ্গুইনের নাম এডেলি।

ফরাসি অভিযাত্রী দ্যু মঁ দ্যরভিল নিজের স্ত্রীর নামে এদের নামকরণ করেছিলেন। এডেলি পেঙ্গুইনরা লম্বায় প্রায় ৩০-৪৫ সেঃ মিঃ। সবচেয়ে বড় পেঙ্গুইনের নাম এম্পারার পেঙ্গুইন। 'সম্রাট'দের উচ্চতা এক থেকে দেড় মিটার। এ ছাড়াও কুমেরু অঞ্চলে পাওয়া যায় কিং, জেন্টু ইত্যাদি নামের বিভিন্ন রকমের পেঙ্গুইন। আমরা যে এলাকায় কাজ করেছিলাম সেখানে এডেলি পেঙ্গুইনই বেশি দেখা যেত। মাঝে-মাঝে দু-চারটে সম্রাট পেঙ্গুইনও চোখে পড়ত। এডেলিদের সামনের দিকটা সাদা রঙের এবং পিঠ ও পাখনাটা কালো। বরফের ওপর এডেলিদের হাঁটাচলাটা অনেকটা ছোট ছেলেমেয়েদের বা সার্কাসের ক্লাউনদের মতো। মনে হয়, এই বুঝি পড়ে যাবে। এডেলিরা মানুষদের ভয় করে না বা এড়িয়ে যায় না। কৌতূহলটাই বেশি। কাছাকাছি এসে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে যেত আমরা ওদের রাজত্বে কী করছি। জলে এরা ২৫-৩০ মিটার গভীর পর্যন্ত ডাইভ করতে পারে। সাধারণত দল বেঁধে জলে ডুব দেয়, সেভাবেই আবার ভেসে ওঠে। এরা দলবদ্ধভাবে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, কেউই নামতে চায় না। পেছনে সরে আসে। কিছুক্ষণ এ-রকম করার পর সবচেয়ে কমজোরিকে জলে ঠেলে দেওয়া হয়। লেপার্ড সিল বা তিমি জলে না-থাকলে সে আবার জলের ওপর উঠে আসে এবং জায়গাটা নিরাপদ জানতে পারার পর অন্যান্য পেঙ্গুইনরা একে-একে জলে নেমে পড়ে।

একবার বৈজ্ঞানিকরা কয়েকটা পেঙ্গুইনকে খাঁচায় ভরে মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে ছেড়ে দেন। তারা কয়েকশো কিঃ মিঃ দূর থেকে আবার নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, এরা সূর্যের সাহায্যে দিকনির্ণয় করে, যেমন আমরা কম্পাসের সাহায্যে করে থাকি। পেঙ্গুইনরা জমাট বরফের ওপর না থেকে বা উত্তরের দিকে না গিয়ে কুমেরু মহাদেশের দিকে যায় কেন এই প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকদের ভাবিয়েছে। মনে হয়, ডিমপাড়া ও বাচ্চাদের বাঁচাবার জন্যই ওরা কুমেরু মহাদেশের তীরবর্তী অঞ্চলে চলে যেতে চায়। সমুদ্রে লেপার্ড সিল ও তিমি ওদের শিকার করবে। তা ছাড়া এরা শীতের পরিবেশে থাকতে চায় এবং বিরাট বড় জায়গায় স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে ভালবাসে। এই সুযোগটা ওরা কুমেরু মহাদেশের তীরবর্তী অঞ্চলেই কেবল পায়। একটু উষ্ণপ্রান্তে এলেই পেঙ্গুইনরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, মরেও যায়।

এরা তীরবর্তী অঞ্চলে ছোট-ছোট পাথরের নুড়ি-ভরাট জায়গায় ডিম পাড়ে। এই সমস্ত জায়গাকে রুকারি (Rookery) বলা হয়। ডিম পাড়ার জন্যে অক্টোবরের মাঝামাঝি কুমেরু মহাদেশের তটবর্তী অঞ্চলে এডেলিরা চলে আসে। মেয়ে-পেঙ্গুইন ছেলে-পেঙ্গুইনদের সঙ্গে সপ্তাহদুয়েক এই রুকারিতে ঘর করে এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি দুটো ডিম পেড়ে সমুদ্রে চলে যায়। ছেলে-পেঙ্গুইন দশ-পনেরো দিন ডিমে তা দেয় এবং এই সময়ে প্রায় অভুক্তই থাকে। মেয়ে-পেঙ্গুইন সপ্তাহ-দুয়েক পরে ফিরে এসে বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করে। তখন ছেলে-পেঙ্গুইন খাবারের খোঁজে সমুদ্রে চলে যায়। ততদিনে ডিম থেকে ছানা বেরিয়ে আসে। মা-বাবারা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে বাচ্চাদের নিজেদের হেফাজতে যত্ন করে রাখে এবং তারপরে খাবারের সন্ধানে সমুদ্রে চলে যায়। তারা ফিরে এলে ক্ষুধার্ত বাচ্চা-পেঙ্গুইনরা তাদের কাছে দৌড়ে চলে আসে। বাচ্চাদের খাওয়াবার দায়িত্ব মা-বাবাকেই নিতে হয়, অন্য পেঙ্গুইনরা এই দায়িত্ব নেয় না। জানুয়ারির শেষের দিকে বাচ্চারা বেশ বড়সড় হয়ে যায় এবং ফেব্রুয়ারিতে বড়দের সাহায্যে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে শেখে। এডেলিরা যখন রুকারি ছেড়ে চলে যায় তখন সম্রাটরা রুকারিতে ডিম পাড়ার জন্যে আসতে শুরু করে। সম্রাট পেঙ্গুইনরা হিম-শীতে ডিম পাড়ে এবং ছানাকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে বড় করতে থাকে। এত ঠাণ্ডায় পেঙ্গুইনরা ছাড়া অন্য কোনও প্রাণী বাঁচতে পারে না।

পেঙ্গুইন ছাড়া অন্য উড়ন্ত পাখিও এখানে দেখা যায়। যথা, স্নো পেট্রেল, স্কুয়া ইত্যাদি। এরা গ্রীষ্মকালে কুমেরু মহাদেশে উড়ে আসে, কারণ তখন সমুদ্রে প্রচুর খাবার পাওয়া যায়। আবার শীতকালে নিজেদের আস্তানায় ফেরে। কুমেরু মহাদেশে পাথুরে জমি এতই অল্প যে এরা বাস করার উপযোগী জায়গা ঠিকমতো পায় না, তাই শীতকালে দূরের

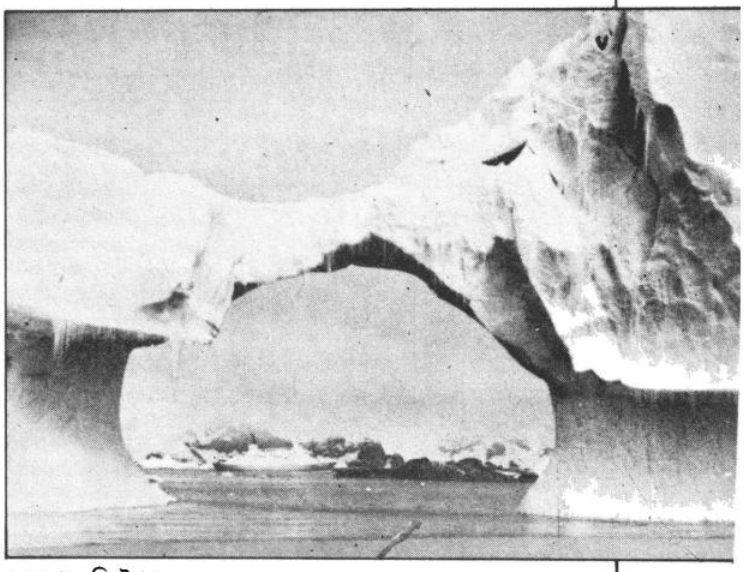

ভাসমান হিমশৈল

দ্বীপে চলে যেতে হয়। স্নো পেট্রেল ও স্কুয়া কুমেরু মহাদেশে ২০০-২৫০ কিমি অভ্যন্তর পর্যন্ত যায় বাসা করার জন্য। এত দক্ষিণে আর কোনও পাখিকেই দেখা যায় না। স্কুয়ারা দূর-দূরান্তরে উড়ে যেতে পারে। একবার একটি চিহ্নিত স্কুয়া কুমেরু মহাদেশ থেকে উড়ে ১৪,০০০ কিমি দূরে উত্তর গোলার্ধের গ্রিনল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছয়। সময় লাগে প্রায় ৬ মাস। স্কুয়ারা লম্বায় ছোটখাটো রাজহাঁসের মতো। এদের ঠোঁট খুব পুরু ও মজবুত। ডানা লম্বায় এক থেকে দেড় মিটারের মতো। স্কুয়ারা পেঙ্গুইন পাখির ডিম ও বাচ্চা-পেঙ্গুইনদের শিকার করে খায়। এ ছাড়াও এদের খাদ্য হচ্ছে সমুদ্রের ক্রিল ও স্কুইড জাতীয় মাছ। ক্যাম্পের কাছে যে-সমস্ত স্কুয়ারা উড়ে বেড়ায়, ক্যাম্পের ফেলে দেওয়া খাবারও তাদের খেতে দেখা গেছে।

পাখি ছাড়া এ-অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় সিল। কুমেরু মহাদেশের চারদিকের দক্ষিণ মহাসাগরে বিভিন্ন রকমের সিল পাওয়া যায়। যেমন, ক্র্যাবইটার, ওয়েডেল, এলিফ্যান্ট, লেপার্ড, রস ও ফার সিল। এদের মধ্যে এলিফ্যান্ট (হস্তী)

সিলের ওজনই সবচেয়ে বেশি। প্রায় ৩৬০০ কেজি। সবচেয়ে কম ওজন ফার সিলের। সিলেদের কান নেই। এদের শরীরের গঠন ও কাঠামো এমনই যে, ওরা এই বিশাল দেহ ও ওজন নিয়েও খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারে। বরফের ওপর ওদের চলাফেরাটা অবশ্য খুব স্বচ্ছন্দ নয়। কুমেরু তীরবর্তী অঞ্চলে বা ভাসমান বরফের চাদরে সারি-সারি সিল দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গে বাচ্চা না থাকলে সিলেদের কাছেও যাওয়া যায়। অবশ্য লেপার্ড সিলদের কাছে যাওয়া নিরাপদ নয়।

ওয়েডেল সিলের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষের মতন অনুমান করা হয়। এরা লম্বায় প্রায় তিন মিটার এবং সিলেদের মধ্যে সবচেয়ে আলসে। এরা খাবারকে খুব দ্রুত ক্যালরিতে পরিণত করে ফেলতে পারে। স্থলদেশের কোনও বড় প্রাণী এই কাজটা দ্রুত করতে পারে না। শরীরকে গরম রাখার প্রণালী (Heating System) এদের এমনই যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও এরা স্বচ্ছন্দেই ঘোরাফেরা করতে পারে। ওয়েডেল সিলকেই সত্যিকারের সিল বলা হয়, কারণ এরাই সবচেয়ে বেশি সময় কুমেরু মহাদেশের তীরবর্তী অঞ্চলে থাকে। অক্টোবরের প্রথম দিকে তাপমাত্রা যখন -১০° সেঃ থেকে -১৫° সেঃ-এর কাছাকাছি, তখন স্ত্রী-সিল বরফের ওপর একটি বাচ্চা দেয়। ওয়েডেল সিলের বাচ্চারা মায়ের দুধ খেয়ে ছেলেবেলায় বেঁচে থাকে। দু'সপ্তাহের মধ্যে তারা দু'গুণ বড় হয়ে সমুদ্রে চলে যায়। অবশ্য আরও একমাস এরা মায়ের দুধের ওপর নির্ভর করে। বাচ্চারা মা-বাবার সঙ্গেই জলে থাকে, যদিও দেখাশোনার দায়িত্বটা মা'কেই পালন করতে হয়।

লেপার্ড সিলেরা কিন্তু ওয়েডেল সিলদের মতো নিরীহ বা ভদ্র নয়। এরা জলে সবচেয়ে দ্রুত ঘোরাফেরা করে। জল থেকে লাফ মেরে পেঙ্গুইন বা সিলের বাচ্চা শিকার করে থাকে। বরফেও এরা দ্রুত চলাফেরা করতে পারে। লেপার্ড সিলেরা লম্বায় ৩-৪ মিটার এবং ওজনে প্রায় ৫৫০ কেজির কাছাকাছি। এরা একলা থাকতেই ভালবাসে। শিকারও এরা একলাই করে থাকে। পেঙ্গুইন বা সিলের বাচ্চা ছাড়া ক্রিল ও স্কুইড এদের খাদ্য। কিলার (Killer) তিমি ছাড়া লেপার্ড সিলকে অন্য কোনও প্রাণী ঘাঁটাতে সাহস পায় না।

রস সিল সবচেয়ে ছোট, সংখ্যায়ও অল্প, প্রায় ৫০ হাজারের কাছাকাছি। এরা গলা দিয়ে যে আওয়াজ করে তা দূর থেকে গানের মতন শোনায়। এইজন্য এদের গায়ক সিল (Singing Seal)-ও বলা হয়। সবচেয়ে বড় সিল হল এলিফ্যান্ট সিল। ওজন প্রায় ৩৫০০ কেজি। এই ওজনের এক-তৃতীয়াংশ হল চর্বি। এদের নাকটা মুখের ওপর ঝোলানো। এরা নাককে বেলুনের মতো ফোলাতে পারে। নাক দিয়ে যে আওয়াজ করে তাতে কাছাকাছি থাকলে চমকে যেতে হয়। অনেক সময় কানে তালাও লেগে যেতে পারে।

কুমেরু মহাদেশে বেশির ভাগই ক্র্যাবইটার সিল। সিলেদের মধ্যে এরা সবচেয়ে সুন্দর। ক্রিল খেয়েই এরা জীবনযাপন করে। এদের ওজন ও আকৃতি ওয়েডেলের মতন। গায়ের চামড়া বেশ চকচকে। বছরের বেশির ভাগ সময়ই কাটায় জমাট বরফের ওপর। তাই কিলার তিমির আক্রমণও এদের ওপরই সবচেয়ে বেশি হয়।

আমাদের কাজের কথায় আবার ফিরে আসি। অভিযানের দ্বিতীয় বিপদ দেখা দেয় নতুন বছরে অর্থাৎ ১ জানুয়ারি। বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার কাজ থেকে ফেরার পথে বরফের পাটাতনে ধাক্কা মারে এবং হেলিকপ্টারের বাইরের দিকের সামনের ভাগ (Nose olio) ভেঙে ঝুলতে থাকে। সামনের দিকের চাকাটাও ভাঙা অবস্থায় ঝুলতে থাকে। এই অবস্থায় ওড়া সম্ভব হলেও হেলিকপ্টারকে নিরাপদে নীচে নামানো খুবই কঠিন কাজ। আমরা পাইলটকে জানাই নিরাপত্তার কারণে হেলিকপ্টারকে জাহাজের ডেকে নামতে দেওয়া সম্ভব নয়। ট্যাঙ্কে জ্বালানি আছে, অতএব বলা হল হেলিকপ্টারকে দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর কাছে বরফের পাটাতনের ওপর নামানোর চেষ্টা করা হোক। এর মধ্যে কাঠের পাটাতন দিয়ে প্রায় এক মিটার উঁচু কাঠের বেদী তৈরি করে ফেলা হয়। পাইলট পেছনের চাকার ওপর ভর দিয়ে হেলিকপ্টারকে নীচে নামিয়ে ধীরে ধীরে হেলিকপ্টারের সামনের দিকটা কাঠের বেদীর ওপর নামিয়ে দেন খুব সাবধানতার সঙ্গে। একটু এদিক-ওদিক হলেই হেলিকপ্টার ভারসাম্য হারিয়ে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যেতে পারত।

এসব বিপদ সত্ত্বেও আমাদের কাজ কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে। বাড়িঘর তৈরির কাজ অনেকখানি এগিয়েছে।

দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর কাছে আমাদের গ্যারেজ, বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করার কথা। এ ছাড়া এখান থেকে ৭৫ কি· মি· দক্ষিণে একটা পাথুরে জমি আছে, লম্বায় প্রায় ২০ কি· মি· ও চওড়ায় দেড় কি· মি·। এই পাথুরে জমিতে সারা বছরে কোনও বরফ জমতে পারে না। তুষারপাত হলেও হাওয়ায় এই বরফ এখান থেকে উড়ে যায়। এই পাথুরে জমিতে বেশ কিছু হ্রদ আছে। হিমবাহ গলে এই হ্রদে সারা বছরই জল থাকে। হ্রদের জল খাওয়া যায়। সমুদ্রের জমা বরফ গলানো জলের মতন এই জল নোনতা নয়। এই রকম একটা হ্রদের কাছে আমরা তিনটে ছোট বাড়ি তৈরি করি। এই পাথুরে জমিতে স্লেজ দিয়ে মাল নিয়ে আসা সম্ভব নয় গ্রীষ্মকালে। বরফের পাটাতনের ওপর গভীর ফাটল থাকে—বিশেষ করে পাথুরে জমির কাছে। এই ফাটল ১০০-২০০ মিটার গভীর। তাই পাথুরে জমিতে কাজ করার জন্য হেলিকপ্টারে সব জিনিসপত্র পাঠাতে হয়।

যথাসময়ে এই পাথুরে জমিতে বাড়িঘর তৈরি করার কাজ শেষ করে ফেলা হয়। এই নতুন স্টেশনের নামকরণ হয় "মৈত্রী", হ্রদটার নাম দেওয়া হয় "প্রিয়দর্শিনী"। চারদিকের পরিবেশ এখানে চমৎকার। গ্রীষ্মকালে চার মাস হ্রদের জল জমতে পারে না। সে-সময় জলে সাঁতার কাটাও চলে।

ভারতের সঙ্গে High Frequency Link বা যোগাযোগ ব্যবস্থাও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া আবহাওয়া, ভূপদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, অণুপ্রাণবিদ্যা (Molecular Biology) পলিমার রসায়ন (Polymer Chemistry) ইত্যাদির গবেষণার কাজও এগিয়ে চলেছে। দলের সদস্যরাও মোটামুটি সুস্থ। অনেককেই ১৬-১৭ ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে। অনেকেই অবশ্য অনিদ্রা রোগে ভুগছে। সময়মতো ঘুম হচ্ছে না। চব্বিশ ঘণ্টা দিন বলে ঘর বা তাঁবু চারদিক দিয়ে ঢেকে দিলেও বাইরে ঝকঝকে রোদ, এই বোধটা মনের ওপর কাজ করে। ফলে অনেকেরই ঘুমের ব্যাঘাত হয়। শীতকালে পরিস্থিতিটা উলটো কিন্তু ঘুমের

ব্যাঘাত থেকেই যায়। এই জাতীয় সমস্যা কুমেরু মহাদেশে সচরাচরই হয়ে থাকে এবং একে বলা হয় ড্যাবডেবে চোখের বা বড়-বড় চোখ করে থাকার (Big Eye) সমস্যা। একদিন ভাল ঘুম হল না, পরের দিন হয়তো বাইরে অনেক কাজ, সে-কাজ করতে কিন্তু ক্লান্তিবোধ হয় না। কারণ, এখানে বাতাসে অক্সিজেন ও ওজোন (Ozone) অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশি। তা ছাড়া পরিবেশদূষণ নেই, তাই প্রচণ্ড কাজকর্মের পরও শরীরে ক্লান্তিভাবটা কম আসে। কুমেরু মহাদেশে আর-একটা সমস্যাও দেখা দেয়। সমস্যাটা হচ্ছে নিঃসঙ্গতা। এ ছাড়াও আছে দিনের পর দিন বিভিন্ন পেশা ও বয়সের সঙ্গে অল্প পরিসরে থাকা ও মানিয়ে চলা।

ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে একদিন শুরু হল প্রবল তুষারঝড়। চলল প্রায় পাঁচদিন। হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ১২৫-১৩০ কি· মি· পর্যন্ত হয়েছিল। ঝড় শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আকাশের রঙ ধূসর হয়ে যায়। কিছুই ঠাহর করা যায় না। বাইরের কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে হল। পাঁচদিন পরে আকাশ আবার পরিষ্কার হল। কাজকর্মও আবার শুরু করা গেল। কুমেরু মহাদেশের তুষারঝড়ের কথা পড়া-শোনা ছিল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও হল। এই তুষারঝড়ে অবশ্য আমাদের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, কেবল কাজের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটেছিল। শীতকালের তুষারঝড় নাকি আরও ভয়ানক। হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় ২০০-২৫০ কি·মি· পর্যন্ত হয়।

এর পর সব ঠিকঠাক চলছে, হঠাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি আবার বিপদ। নৌ-বাহিনীর ছোট হেলিকপ্টারের চালক কাজ থেকে ফেরার পথে ঠিক জাহাজের ডেকে নামবার সময় বুঝতে পারলেন যে, পেছনের দিকের ব্লেডগুলো (Rotor) কাজ করছে না। এই অবস্থায় হেলিকপ্টারকে জাহাজের ডেকে নামানো সম্ভব হল না। নামাতে হল ৪ কি·মি· দূরে একটা ভাসমান হিমশৈলের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বড় হেলিকপ্টার হিমশৈলের ওপর নামানো হয় ছোট হেলিকপ্টারের পাইলট ও কো-পাইলটকে জাহাজে ফিরিয়ে আনার জন্য। হিমশৈলের ওপরেই হেলিকপ্টার মেরামতের ব্যবস্থাও করা হয়। ১২-১৪ ঘণ্টা ধরে মেরামত করে হেলিকপ্টারকে জাহাজে নিয়ে আসা হয়। এই সুযোগে হিমশৈলের ওপর চলাফেরা করার অভিনব অভিজ্ঞতাও অর্জন করলাম আমরা কয়েকজন।

এ-সমস্ত ঘটনা ছাড়াও জাহাজ নোঙরের ব্যাপারে আমাদের এক বিরাট সমস্যায় পড়তে হয়। অন্যান্য ভারতীয় অভিযান এই জাতীয় অসুবিধের সম্মুখীন হয়নি। বিদেশের অভিযানও এরকম অসুবিধেয় সাধারণত পড়ে না। এবারকার অভিযানে জাহাজ কোনও সময়েই ছ' ঘণ্টার বেশি এক জায়গায় নোঙর করে থাকতে পারেনি। ব্যাপারটা হল অনেকটা এই ধরনের : কলকাতার চৌরঙ্গি অঞ্চলে বাড়িঘর তৈরি ও অন্যান্য কাজের জন্য যেন মালপত্র নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে একদিন বর্ধমানে, একদিন কৃষ্ণনগরে এবং একদিন খড়্গপুরে। আমাদের জাহাজও বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন জায়গায় নোঙর করে এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মালপত্র নামাতে হয়। এর ফলে সমস্ত কাজের পরিচালন-ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে।

যাই হোক, অসুবিধে ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমরা সব কাজই নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে সমর্থ হই। গত বছরের

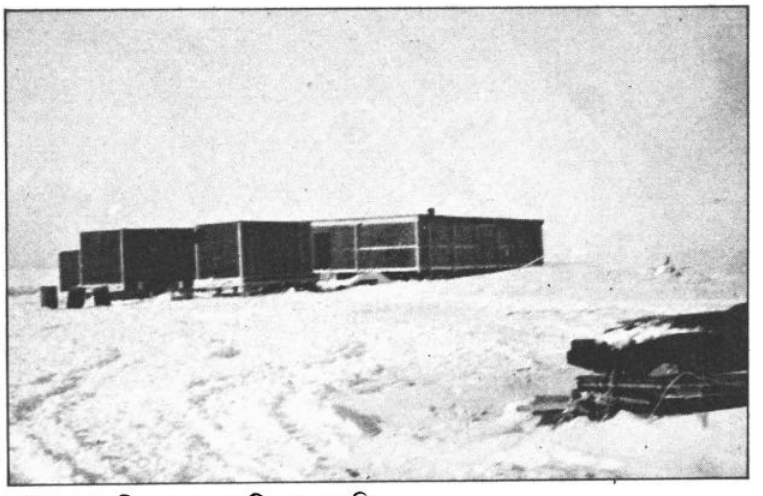

দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর কাছে একটি নতুন বাড়ি

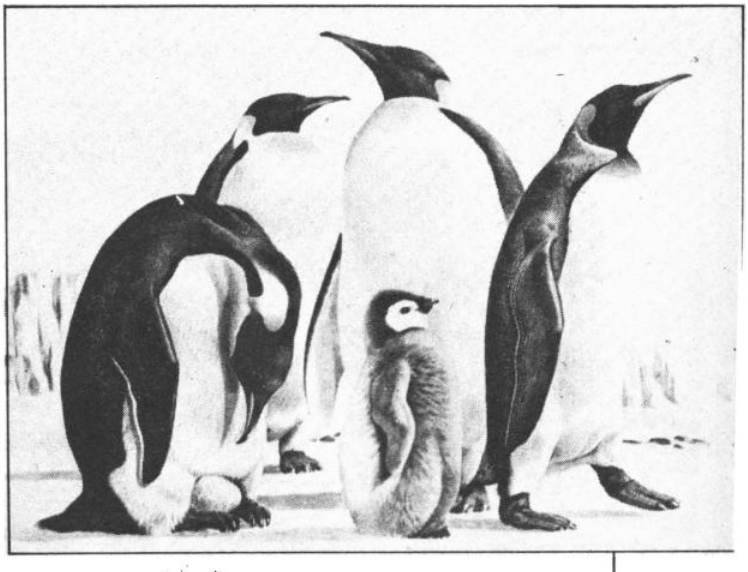

বাচ্চা-সমেত পেঙ্গুইন-পরিবার

বারোজন সদস্যকেও যথাসময়ে জহাজে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। আমাদের দলের ১৩ জন শীতকালীন সদস্যকে দক্ষিণ গঙ্গোত্রী কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়াও হয়েছে। এঁদের সারা বছরের জ্বালানি, খাবার-দাবার, ওষুধপত্র ইত্যাদিও কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

কাজ শেষ করে আমরা ১ মার্চ বেলা আড়াইটেয় কুমেরু মহাদেশ থেকে ভারত অভিমুখে রওনা হব ঠিক করলাম। শীতকালীন সদস্যদের বিদায়কালীন মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানানো হল জাহাজে। সবাই আসতে পারবেন না। অন্তত দুজন সদস্যকে কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে থেকে যেতে হবে। ১ মার্চ সকাল দশটা থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করল। বেলা ১২টা নাগাদ ১১জন শীতকালীন সদস্য স্নো-ভেহিকেলে ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে উপকূলে এলেন। তখন আবহাওয়া বেশ খারাপ। জাহাজের ক্যাপ্টেন জানালেন, এখন জাহাজ থেকে সিঁড়ি নামানো মোটেই নিরাপদ হবে না। আমিও দেখলাম এই শেষ মুহূর্তে ঝুঁকি নেওয়া মোটেই উচিত হবে না। অস্বস্তিতে আছি, অতিথিদের নেমন্তন্ন করেও ওপরে নিয়ে আসতে পারছি না। খাবারের টেবিল

প্রিয় লেখক, প্রিয় বই

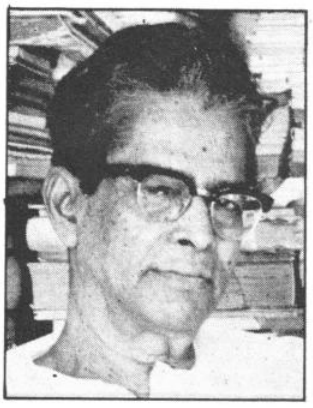

শুধু ঘনাদার গল্প লিখেই প্রেমেন্দ্র মিত্র অমর হয়ে থাকতে পারতেন। বল্‌গাহীন কৌতুককল্পনার রাজা এই ঘনাদার বিচিত্র কীর্তিকাহিনী, অনিঃশেষ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মজাদার মেসবাড়ি ও তার স্মরণীয় বাসিন্দারা, সন্দেহ নেই, ছোটদের মহলে যেমন বড়দের মহলেও তেমনি, চিরকালের জন্য জায়গা করে নিয়েছে। এহেন ঘনাদার দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার গল্প নিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে যে-তিনটি বই বেরিয়েছে, প্রত্যেকটিই দারুণ জনপ্রিয়। আবার এই ঘনাদাকে কোথা থেকে পেলেন তিনি, ঘনাদার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের কেন্দ্র করে রচিত ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী সংকলনে—'ঘনাদা তস্য তস্য অমিনিবাস'-এ— যখন শোনান প্রেমেন্দ্র মিত্র, তখন মনে না হয়ে যায় না যে, বিজ্ঞানের মত ইতিহাসের রহস্য-রোমাঞ্চও কোনো অংশে কম নয়। এ-বই ছাড়াও আরেকটা যে-ছোটদের বই তার নাম হল 'ছড়া যায় ছড়িয়ে'। উচ্ছল কৌতুকে, হালকা গড়নে, শব্দের যথার্থ প্রয়োগে, বুদ্ধিদীপ্ত পরিমিতিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়ায় যে-সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদ, তারই নমুনা এই ছড়ার বইতে। সঙ্গে সুধীর মৈত্রের চোখ-জুড়োনো ছবি।

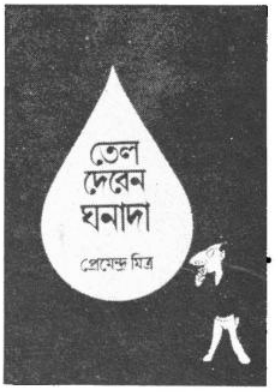

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটদের গ্রন্থসম্ভার :

যাঁর নাম ঘনাদা ৮·০০
ঘনাদার ফুঁ ৮·০০
তেল দেবেন ঘনাদা ৬·০০
ছড়া যায় ছড়িয়ে ৫·০০
ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস ৩৫·০০

আরো অনেক লেখকের অনেক মন-মাতানো বইয়ের জন্য চলে এসো আনন্দ পাবলিশার্স-এর সেই বইয়ের দোকানে ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ ঠিকানায় যে-দোকান কিনা শুধু ছোটদের জন্য

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯

তৈরি। অন্যান্য সদস্যরা জাহাজে অস্থির হয়ে পড়ছেন। তাঁরা চান শীতকালীন সদস্যদের ওপরে নিয়ে আসা হোক। আমি জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলাম আমন্ত্রিত সদস্যদের ওপরে আনা যাবে না, বরং ক্রেনে জাল ঝুলিয়ে খাবার-দাবার নীচে পাঠানো হবে। শীতকালীন দলের নেতা লেঃ কর্নেল কুমরেশকে সব বললাম এবং আমার সিদ্ধান্ত জানালাম। কুমরেশ ও ওঁর দলের অন্যান্য সদস্যরা সবাই আমার সঙ্গে একমত হলেন। জাল দিয়ে খাবার পাঠানো হল এবং নীচে থেকে শীতকালীন সদস্যদের আত্মীয়স্বজনদের লেখা চিঠিপত্র ওপরে নিয়ে আসা হল। এরপর ওয়াকিটকি মারফত শীতকালীন সদস্যদের আমরা সবাই বিদায় জানালাম। সমুদ্রের বড়-বড় ঢেউ জাহাজকে মোচার খোলার মতো দোলাচ্ছে। শীতকালীন সদস্যদের তাড়াতাড়ি কেন্দ্রে ফিরে যেতে বললাম। একে-একে অন্যান্য সদস্যরা ওয়াকিটকি মারফত জাহাজ থেকে শীতকালীন সদস্যদের বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে গেলেন। ক্রমেই আবহাওয়া খারাপ হতে থাকল। শেষ পর্যন্ত বেলা ২-৪০ মিনিটে (ভারতীয় সময় সন্ধে ৬-১০) জাহাজ ধীরে-ধীরে উপকূল থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। শীতকালীন সদস্যরাও গাড়ি করে কেন্দ্রের দিকে ফিরে যাচ্ছেন। আমি চিন্তিত। জাহাজ দোল খাচ্ছে বলে নয়। এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় শীতকালীন সদস্যদের বিপদের মধ্যে না পড়তে হয় মাঝপথে। বেতার মারফত ওঁদের সঙ্গে ঘন-ঘন যোগাযোগ করছি। ওঁরা ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছেন কেন্দ্রের দিকে। কিছুক্ষণ পরে জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। কয়েকবারই চেষ্টা করলাম, কিন্তু যোগাযোগ করতে পারলাম না। শেষে যোগাযোগ করলাম কেন্দ্রের দু'জন সদস্যর সঙ্গে। শীতকালীন দল এর মধ্যেই কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছেন আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ হওয়ায় ওঁরা আর এগোচ্ছেন না এবং এক জায়গায় তিনটে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সবাই একটা গাড়িতে জড়ো হয়েছেন। খাবার-দাবারের অভাব নেই। আমরা অনেক খাবার-দাবার নীচে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কেন্দ্র থেকে আমাকে জানাল যে, চিন্তার কোনও কারণ নেই। ওঁরা ২০-২৫ কি·মি· দূরেই আছেন। আবহাওয়া একটু ভাল হলেই ওঁরা আবার রওনা হবেন কেন্দ্রের দিকে। কেন্দ্রের দুজন সদস্যকে জিজ্ঞেস করলাম, ওঁদের দুজনের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না, একাকিত্ব বোধ করছেন কি না কিংবা কেবল দুজন থাকায় ভয় করছে কি না ? ওঁরা দুজনেই অভয় দিলেন। আমার দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমল। অবশ্য শীতকালীন দল কেন্দ্রে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। কেন্দ্রের দুজন সদস্যই আমাকে বললেন, "রাত হয়ে গেছে, আপনি শুয়ে পড়ুন। ওঁরা ফিরে এলেই আমরা জাহাজে খবর দেব।" আমি ভোর চারটেয় আবার কেন্দ্রে খোঁজ নিলাম। জানতে পারলাম, কিছুক্ষণ আগেই সবাই নিরাপদে কেন্দ্রে ফিরে গেছেন। যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

চব্বিশ দিনে সমুদ্রযাত্রা শেষ করে আমরা ২৫ মার্চ, ১৯৮৫ সালে সকাল ৯টায় গোয়া বন্দরে পৌঁছলাম। গোয়াবাসীর বিপুল সম্বর্ধনার মধ্যে চতুর্থ অভিযানের আমরা সবাই একে-একে ভারতের মাটি স্পর্শ করলাম। মনে-মনে বললাম, "ও আমার দেশের মাটি..."

বেলুন উড়িয়ে আবহাওয়া-গবেষণা

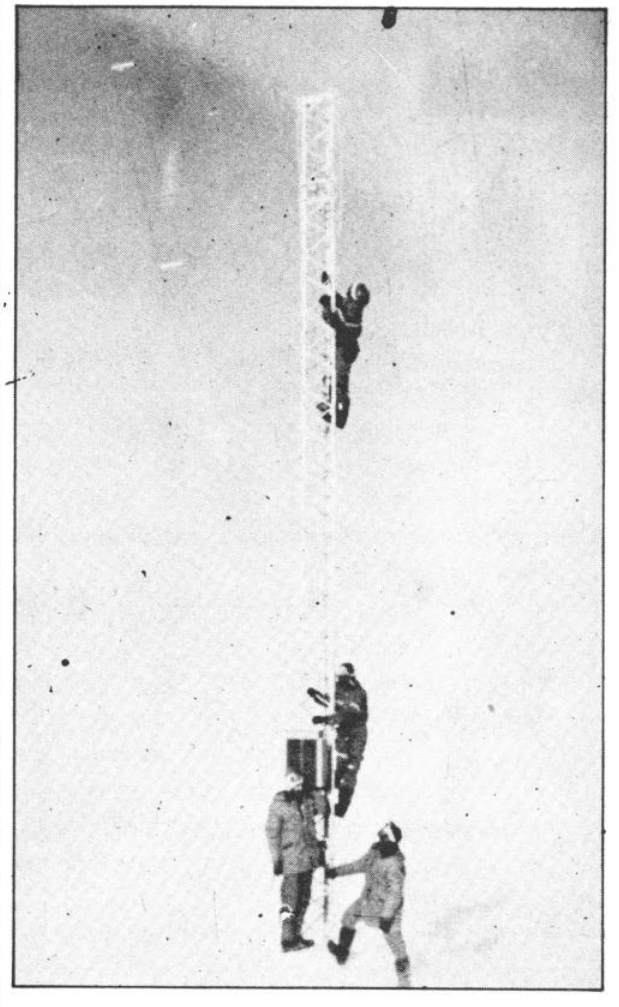

যোগাযোগ-কেন্দ্রের কাজ চলছে

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে পঞ্চানন্দ জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা উদ্ভটবিজ্ঞানী শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি তাঁর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে গজ-পালোয়ানের কাছে। আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে যে-মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, বাসের মধ্যে খুন হয় তাঁর সেক্রেটারি। গজ'র ডেরা চকসাহেবের পোড়োবাড়িতে ঢুকে যে-লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। মধ্যরাতে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে মূল্যবান কিছুর খোঁজে ঢুকেছিল গজ ; তিন অতিকায় মূর্তি তাকে বন্দী করে। চকসাহেবের বাড়িতে উঁকি মেরে পঞ্চানন্দ যাকে দেখতে পায়, তার ক্ষমতা সীমাহীন। হরিবাবু ছাতে উঠে নীল চাঁদ দেখে কবিতা লেখেন। পঞ্চানন্দ বলে, সেটা উড়ন্ত চাকি। চকসাহেবের বাড়িতে যাবার পথে সে আক্রান্ত হয়। ঢ্যাঙা আততায়ীকে ঘায়েল করে সেই তিনটে অতিকায় লোক, গজকে যারা আটকে রেখেছে। বিদ্যুতের বেড়া অপসৃত হয়েছে বুঝে এগিয়ে যেতেই কাঁকড়াবিছের কামড় খায় গজ, তারপর খানিক হেঁটে এক জলায় বেহুঁশ পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পঞ্চানন্দও খানিক এগিয়ে গজ'র খোঁজ পায়। কিন্তু গজ'র ছিপছিপে শরীর ইতিমধ্যে হাতির মতন হয়ে গেছে। এদিকে উড়ন্ত চাকি দেখে ঘড়ি ও আংটিও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চকসাহেবের বাড়িতে ঢুকে আংটি ঘুম লাগায়। ওদিকে ঘড়ি একটা গুহায় ঢুকে যে-কাঁকড়াবিছেটাকে জুতোর তলায় চেপে ধরে, সেটা যান্ত্রিক। তার দাঁড়া অ্যান্টেনার মতো। তারপর...

অন্ধকারে যখন আংটি চোখ মেলল, তখন তার মাথাটা ঘুমে ভরা। কোথায় শুয়ে আছে সেই বোধটা পর্যন্ত নেই। কিছুক্ষণ ভোম্বলের মতো চেয়ে থাকার পর হঠাৎ সে তড়াক করে উঠে বসল। বিছানার পাশে একটা ভূত দাঁড়িয়ে আছে।

ভূত যে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। মুখটা ভাল দেখা না গেলেও এরকম শীর্ণকায় এবং লম্বা চেহারার লোক বড় একটা নেই। এই সেই নকল রাজার সেক্রেটারি, যাকে সে এবং তার দাদা ঘড়ি বাসের মধ্যে খুন হতে দেখেছিল।

মারপিট আংটি বিস্তর করেছে, কিন্তু ভূতের সঙ্গে কীভাবে লড়তে হয় তা তার অজানা। তার ওপর তার ভূতের ভয়ও আছে।

সুতরাং আংটি একটা বিকট খ্যা-খ্যা শব্দে গলাখাঁকারি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কে, কে আপনি ?"

লম্বা সিড়িঙ্গে ছায়ামূর্তিটা আংটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। পাথরের মতো স্থির। আংটির প্রশ্নের জবাবে একটু ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "তুমি এখানে কী করছ ?"

আংটি তোতলাতে লাগল, "আ···আমি···আমি···কিন্তু আ-আপনি তো মরে গিয়েছিলেন !"

লম্বা লোকটা নিজের কোমরে হাত দিয়ে কোনও একটা বোতাম টিপল। আংটি দেখল লোকটার পায়ের দিকে, বোধহয় জুতোয় লাগানো একটা আলো জ্বলে উঠল এবং লোকটাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। তবে তলার দিক থেকে আলো ফেললে যে-কোনও মানুষকে একটু ভৌতিক-ভৌতিক দেখায়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা গায়ে আলো ফিট করা লোক জীবনে দ্যাখেনি আংটি।

সে ফের আমতা-আমতা করে বলল, "আ-আপনি কিন্তু আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন।"

লোকটা মৃদু ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "এখন দ্যাখো তো, আমি মরে গেছি বলে কি মনে হচ্ছে ?"

আংটি দেখল, বাস্তবিকই লোকটার শরীরে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। একটু ভুতুড়ে দেখালেও লোকটাকে তার জ্যান্ত বলেই মনে হচ্ছিল। মাথাটা গুলিয়ে গেল আংটির। সে বোকার মতো জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জ্যান্ত মানুষ ?"

লোকটা আলো নিবিয়ে দিয়ে বলল, "জ্যান্ত কি না জানি না, তবে ভূতটুত নই।"

"তা-তার মা-মানে ?"

"মানে বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। সে কথা থাক। এখন বলো তো, তোমরা দুই ভাই আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলে কেন ?"

"আমরা ভেবেছিলাম, আপনারা আমাদের কিডন্যাপ করছেন।"

"কিডন্যাপ কি ওভাবে করে ? তোমাদের খেলা দেখে মহারাজ খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি তোমাদের উপকারই করতে চেয়েছিলেন। পালিয়ে এসে তোমরা ওঁকে অপমান করেছ।"

দাদা ঘড়ি সঙ্গে থাকলে আংটি তেমন ভয় খায় না। কিন্তু একা বলেই তার বেশ ভয়-ভয় করছিল। সে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "উনি যে আমাদের উপকার করতে চেয়েছিলেন তা আমরা বুঝতে পারিনি।"

"তা না হয় পারোনি, কিন্তু তোমরা ওঁকে মারারও চেষ্টা করেছ। আজ অবধি ওঁর গায়ে হাত তুলে কেউ রেহাই পায়নি।"

আংটি তাড়াতাড়ি বলল, "আমি সেজন্য মাপ চাইছি।"

"মাপ স্বয়ং মহারাজের কাছেই চাওয়া উচিত। উনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার সঙ্গে এসো।"

আংটি অবাক হয়ে বলল, "উনি কি এখানে আছেন ?"

"আছেন বইকী।"

আংটি চারদিকে একবার চেয়ে দেখে নিল। দাদা ঘড়ি সঙ্গে নেই, সে একা। এই অবস্থায় আবার এদের খপ্পরে পড়লে রেহাই পাওয়া অসম্ভব হবে। সুতরাং পালাতে হলে এই বেলাই পালানো দরকার। সিড়িঙ্গে লোকটা বোধহয় দৌড়ে তার সঙ্গে পেরে উঠবে না। পারলে জঙ্গলের মধ্যেই তাদের তাড়া করত।

আংটি যখন এসব ভাবতে-ভাবতে গড়িমসি করছে, তখন লোকটা বলল, "পালানোর কথা ভাবছ ?"

আংটি আমতা-আমতা করে বলল, "তা নয় ঠিক।"

"পালালে আমরা কিছুই করব না। যখন আগেরবার পালিয়েছিলে তখন আমরা অনায়াসেই তোমাদের ধরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু মহারাজের সেরকম ইচ্ছে নয়। তাই

তোমাদের পালাতে দেখেও আমরা কিছুই করিনি। এবারও করব না।"

আংটি ভয়ে ভয়ে বলল, "কিন্তু সেবার আপনি আমাদের পিছু নিয়েছিলেন। বাসের মধ্যে আপনাকে কে যেন গুলি করেছিল।"

লোকটা নিরুত্তাপ গলায় বলল, "আমি মোটেই তোমাদের পিছু নিইনি। অন্য একটা জরুরি কাছে মহারাজ আমাকে পাঠিয়েছিলেন। পথে কে বা কারা আমাকে খুন করার চেষ্টা করে।"

"হ্যাঁ, আপনার বুকে গুলি লেগেছিল।"

"গুলি নয়। তার চেয়ে অনেক মারাত্মক কিছু। কিন্তু আসল কথা, আমি তোমাদের পিছু নিইনি। আজও নেব না। তোমার বা তোমাদের কারও কোনও ক্ষতি করা মহারাজের উদ্দেশ্য নয়।"

আংটি এই বিপদের মধ্যেও যেন একটু ভরসা পেল। লোকটার কথার মধ্যে একটু সত্যও থাকতে পারে।

সে জিজ্ঞেস করল, "উনি কোথাকার মহারাজ?"

"উনি মহারাজ নামে। ইচ্ছে করলে উনি গোটা দুনিয়াটারই সম্রাট হতে পারেন। কিন্তু তেমন ইচ্ছে তাঁর নেই।"

"আপনার বুকে গুলি লাগা সত্ত্বেও আপনি বেঁচে আছেন কী করে?"

"সে সব মহারাজ জানেন। এ পর্যন্ত আমাকে অনেকবারই খুন করবার চেষ্টা হয়েছে। কোনওবারই মরিনি। একটু আগেই কতগুলো বর্বর আমাকে আক্রমণ করেছিল। এতক্ষণ আমার বেঁচে থাকার কথা নয়। তবু দ্যাখো, দিব্যি বেঁচে আছি।"

কথাগুলো আংটি ভাল বুঝতে পারছিল না। খুব হেঁয়ালির মতো লাগছিল। একটু দুরুদুরুও করছিল বুক। কিন্তু সে প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। বলল, "মহারাজের কাছে যদি যেতে না চাই, তা হলে সত্যিই উনি কিছু করবেন না?"

"না। তবে গেলে তোমারই লাভ হবে। অকারণে ভয় পেও না। তোমার ক্ষতি করতে চাইলে অনায়াসেই করতে পারি। আমার কাছে এমন ওষুধ আছে চোখের পলকে তোমাকে অজ্ঞান করে দেওয়া যায়। এমন অস্ত্র আছে যা দিয়ে তোমাকে ধুলো করে দেওয়া কিছুই নয়। তবে সেসব আমরা প্রয়োগ করার কথা চিন্তাও করি না।"

আংটি কাঁপা গলায় বলল, "ঠিক আছে। মহারাজ কোথায়?"

"আমার সঙ্গে এসো।"

আংটি লোকটার পিছু-পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

লোকটা কোমরের বোতাম টিপে জুতোর আলোটা জ্বালিয়ে নিয়েছে। বেশ ফটফটে আলো। এরকম সুন্দর আলোওলা জুতো আংটি কখনও দ্যাখেনি। জুতোর ডগায় দুটি ছোট হেডলাইটের মতো জিনিস বসানো। আলোটা নীলচে এবং তীব্র।

সিড়িঙ্গে লোকটা একটা ধ্বংসস্তূপের ওপরে উঠল। স্তূপের ওপরে একটা ড্রাম বসানো। দেখলে মনে হয়, পুরনো ড্রাম এমনি পড়ে আছে।

লোকটা ড্রামটাকে দু'হাতে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে ফেলল। তলায় একটা গর্ত।

লোকটা বলল, "নিশ্চিন্তে নামো। কোনও ভয় নেই।"

আংটি একটু ইতস্তত করল। ভয় করছে বটে, কিন্তু ভয় পেলে লাভ নেই। তাই সে 'দুর্গা' বলে গর্তের মধ্যে পা বাড়াল।

না, পড়ে গেল না আংটি। গর্তের মধ্যে থাক-থাক সিঁড়ি। কয়েক ধাপ নামতেই সিড়িঙ্গে লোকটাও গর্তের মুখ বন্ধ করে তার পিছু-পিছু নেমে এল।

আংটি দেখল, তলাটা অনেকটা সাবওয়ের মতো। একটু নোংরা আর সরু, এই যা। তবে দেখে মনে হয়, এই সাবওয়ে বহুকালের পুরনো। বোধহয় এই বাড়ি যখন তৈরি হয়েছিল তখনই চক-সাহেব এই সুড়ঙ্গ বানিয়েছিলেন। আংটি, ঘড়ি এবং তাদের বন্ধুরা বহুবার এ-বাড়িতে এসে চোর-চোর খেলেছে, গুপ্তধনের সন্ধান করেছে। কিন্তু এই সুড়ঙ্গটা কখনও আবিষ্কার করতে পারেনি।

একটু এগোতেই ফের সিঁড়ি। এবার ওপরে ওঠার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আংটি যেখানে হাজির হল, সেটা এক বিশাল হলঘর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এরকম ঘর যে এ-বাড়িতে থাকতে পারে তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। ঘরে বিজলি বাতির মতো আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু খুব মৃদু। ঘরের একধারে কয়েকটা যন্ত্রপাতি রয়েছে। একটা যন্ত্র থেকে অবিরল নানারকম চিঁ-চিঁ, কুঁই-কুঁই, টর-র টর-র শব্দ হচ্ছে।

হলঘরের অন্যপ্রান্তে একটা টেবিলের সামনে বসে একজন লোক অখণ্ড মনোযোগে একটা গ্লোব দেখছে। গ্লোবটা নীল কাচের মতো জিনিসে তৈরি। তাতে নানারকম আলো।

লোকটাকে চিনতে মোটেই কষ্ট হল না। মহারাজ।

মহারাজ আংটির দিকে তাকালেন।

আংটি ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মহারাজ তাকে দেখে হাসলেন। হাসিটা ভারী মিষ্টি, ভারী সুন্দর। রাগ থাকলে এরকম করে কেউ হাসতে পারে না।

মহারাজ ভরাট গলায় বললেন, "এসো আংটি, তোমার জন্যই বসে আছি।"

আংটি এক পা দু' পা করে এগিয়ে গেল।

মহারাজের ইঙ্গিতে সিড়িঙ্গে লোকটা একটা টুল এগিয়ে দিল।

আংটি মুখোমুখি বসতেই মহারাজ বললেন, "তুমি খুব ভয় পেয়েছ বলে মনে হচ্ছে।"

আংটি বলল, "না, এই একটু..."

মহারাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে দুঃখ এই যে, পৃথিবীকে কতগুলো বর্বরের হাত থেকে বাঁচানো বোধহয় সম্ভব হবে না। অনেক চেষ্টা করছি। কিন্তু..."

বলেই মহারাজ তাঁর গোলকের ওপর ঝুঁকে কী একটা দেখতে লাগলেন।

আংটি কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে রইল।

মহারাজ ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টকে বললেন, "খুব তাড়াতাড়ি আমার আর্থ মনিটরটা নিয়ে এসো তো।"

সিড়িঙ্গে লোকটা দৌড়ে গিয়ে একটা ক্যালকুলেটরের মতো যন্ত্র নিয়ে এল। (ক্রমশ)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব তৈ তৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

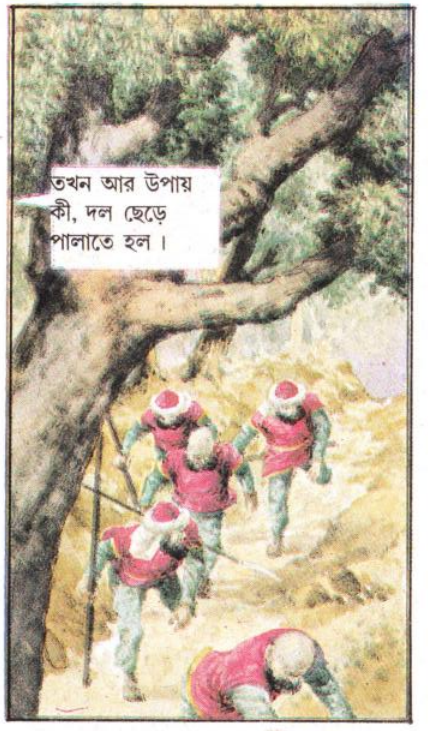

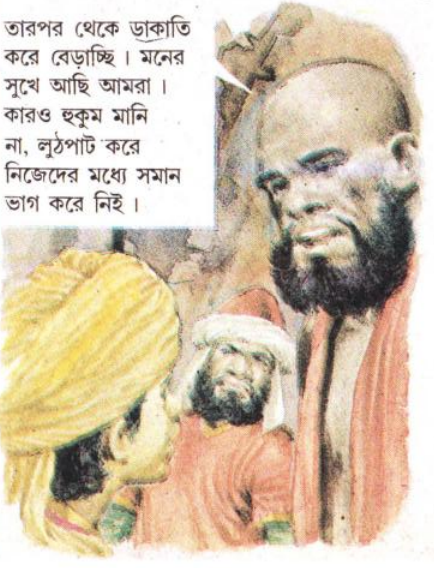

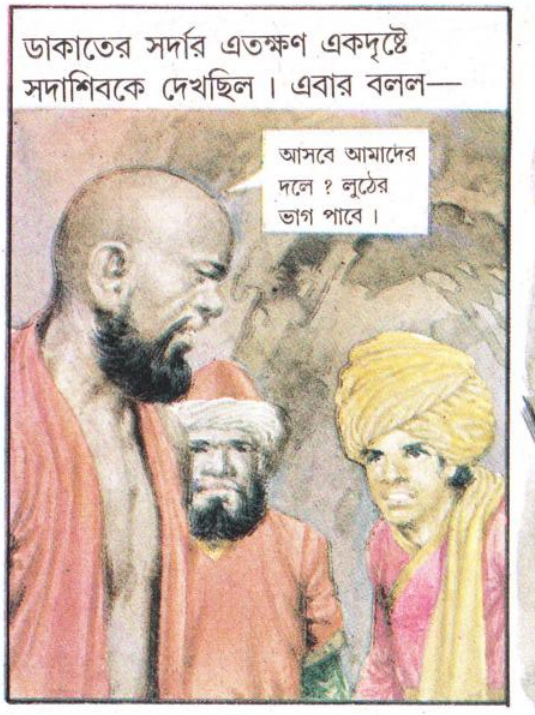

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

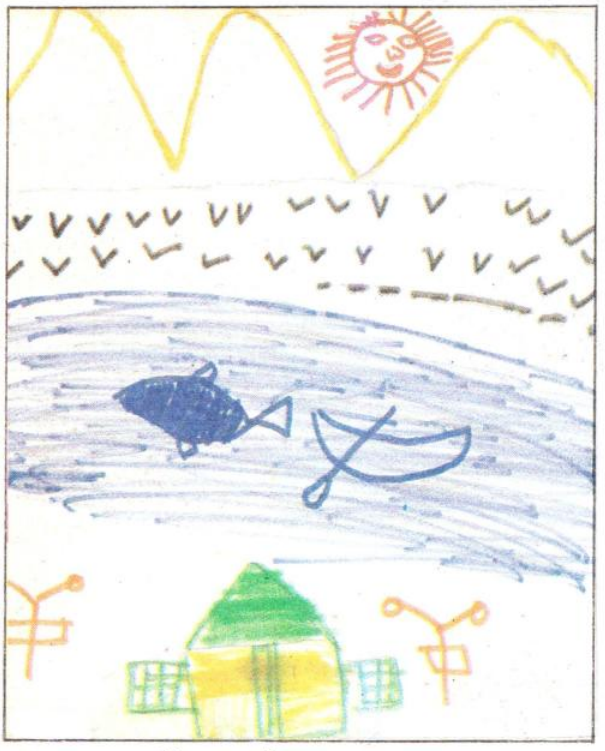

ছবি এঁকেছে **সন্দীপ বাগচী** (বয়স ১০)

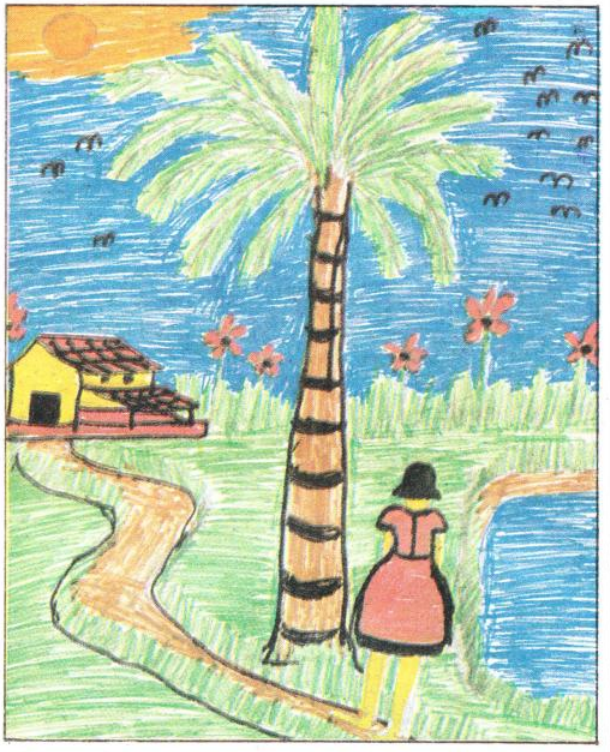

ছবি এঁকেছে **মনুয়া ঘোষ** (বয়স ৭)

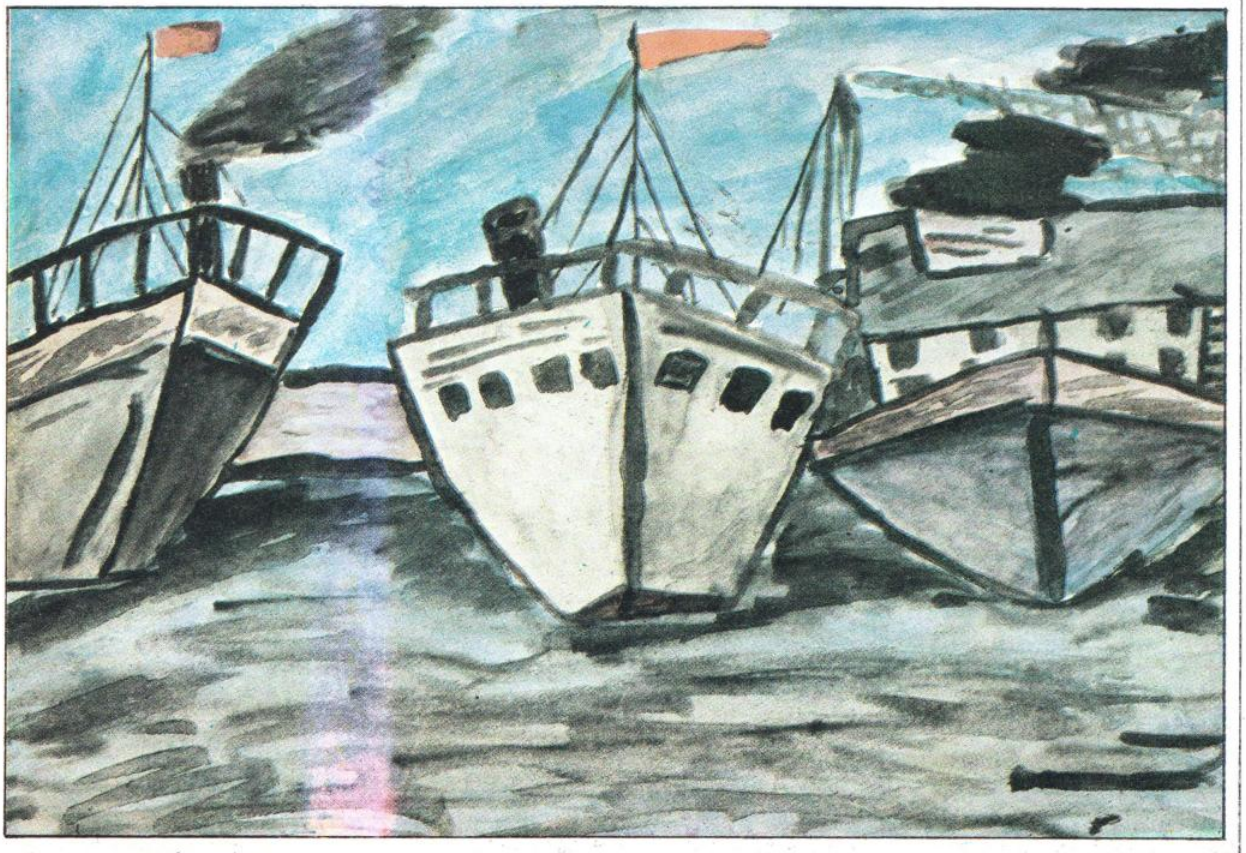

ছবি এঁকেছে **অর্ণব চট্টোপাধ্যায়** (বয়স ১১)

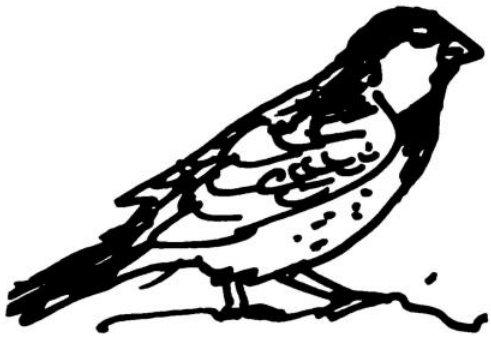

টুকাইয়ের কথা

একদিন দুপুরবেলা আমি শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখি খোলা জানলা দিয়ে একটা চড়ুই আমাদের বাড়িতে ঢুকল। আমি চুপিচুপি গিয়ে দরজা ও জানলা বন্ধ করে দিলাম। অমনি সে উড়ে এসে হঠাৎ আমার পায়ে ঠোক্কর দিল। আমার কিন্তু তাতে লাগল না।

আমি তাকে তাড়া দিতেই সে ফ্যানের ওপর গিয়ে বসল। ভাগ্যিস ফ্যানটা চলছিল না, চললে ওর মাথা কেটে যেত ঠিক। তারপর ও জানলায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। তখন আমি ওকে ধরে ফেললাম। ওকে আমি একটা খাঁচায় রাখলাম। তখন থেকে সে আমার পোষা পাখি হয়ে গেল।

আমি ওর জলের পাত্রে রোজ জল দিতাম। রোজ ওকে খেতে দিতাম। ওর নাম রাখলাম টুকাই। টুকাই রোজ ভোরে উঠেই কিচিরমিচির করত। রাতে ওর খাঁচা ঢাকা থাকত। ভোরে উঠে আমি সেটা খুলে দিতাম। ওর জল পালটে দিতাম, খাবার দিতাম। টুকাই আস্তে আস্তে আমাকে খুব ভালবাসতে লাগল। ও আমার হাতের উপর বসত, কিন্তু উড়ে যেত না।

একদিন হয়েছে কি, আমি বাইরে খেলছি এমন সময় একটা চড়ুই এসে আমার হাতে ঠোক্কর দিল। আমার হাতে খুব ব্যথা লাগল। মনে হল যে টুকাইকে খাঁচায় রাখবার জন্য পাখিটি আমাকে আঘাত করেছে। বাড়ি এসে আমি টুকাইকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে ও আবার ফিরে এসে আমার হাতে বসল।

তখন থেকে আমি আর ওকে খাঁচায় রাখতাম না। কাপড় মেলার জন্য একটা দড়ি ছিল, তার ওপর বসেই ঘুমোত সে। একদিন আর একটা চড়ুই এসে আমাদের বাড়িতে ঢুকল। একটু পরে টুকাইও বাড়ি এল। ওরা দুজনে অনেকক্ষণ গল্প করল, তারপর দুজনে চলে গেল।

পরদিন একটু বেলা করেই উঠেছি। কই টুকাই তো আমার ঘুম ভাঙাল না। দেখি টুকাই বাড়ি নেই। তারপর টুকাই আর কোনও দিনও ফিরে আসেনি।

অর্ণব মজুমদার (বয়স ১১)

জু

আমার আছে একটি কুকুর
নাম তার জু,
ছুটে বেড়ায় এদিক-সেদিক
স্বভাব নয় 'কু'।
বুলিপিসিদের পুষিটা
যেই গিয়েছে মারা—
মনের দুঃখে পিসিমণি
কেঁদে হল সারা।

শৈবাল দাস (বয়স ১০)

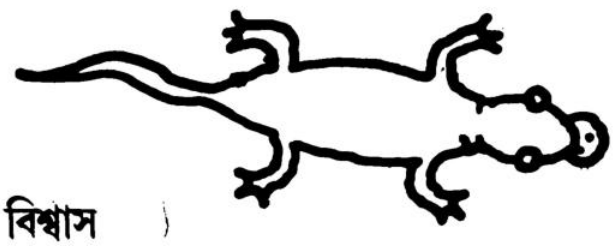

বিশ্বাস

আমার ভাই খুব দুষ্টু। সব ব্যাপারেই তার ভীষণ কৌতূহল। আমার ঠাকুমা রোজ তাঁর গোপালের মূর্তির সামনে মিষ্টি সাজিয়ে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করেন। অনেকক্ষণ বাদে যখন চোখ খোলেন তখন দেখেন রেকাবিতে মিষ্টি নেই। ঠাকুমা সকলকে বলেন যে, তাঁর গোপাল রোজ মিষ্টি খেয়ে যায়।

ভাইও ভাবে, কিছু একটা ঘটছে যার জন্য কোনওদিন গোপালের মূর্তির সামনে মিষ্টি থাকে না। একদিন ঠাকুমা ধ্যানে বসলে ভাই চুপ করে ঠাকুমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ দেখে যে, একটা টিকটিকি মিষ্টি মুখে করে নিয়ে পালাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে সে ধাক্কা মেরে ঠাকুমার ধ্যান ভাঙিয়ে দিল। ঠাকুমা দেখলেন তাঁর গোপালের বদলে একটা টিকটিকি মিষ্টি মুখে নিয়ে পালাচ্ছে।

ব্যাপারটা দেখে ঠাকুমা প্রথমে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন সব বুঝতে পারলেন তখন তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। একটু পরে নিজের মনকে শান্ত করে ভাইকে বললেন, "ভগবান কি কখনও নিজের রূপে দেখা দেন! তাই টিকটিকির রূপে এসে মিষ্টি খেয়ে যান গোপাল।"

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১০)

বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : জন টার্নারের ভাড়াটে চার্লস ম্যাকার্থি ঝিলের ধারে খুন হয়েছেন। ঘটনার আগে চার্লসের ছেলে জেমসকে নাকি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখা গিয়েছিল। পুলিশ জেমসকে গ্রেফতার করে। করোনারকে জেমস জানায়, একটা সাংকেতিক ডাক—যা শুধু তার ও তার বাবার মধ্যে চলত—শুনে সে ঝিলের ধারে ছুটে গিয়েছিল। বাবার সঙ্গে কী নিয়ে তার কথা হয়েছিল, তা সে বলতে নারাজ। সকলের বিশ্বাস, সে-ই খুনি। যারা মনে করে সে নির্দোষ, টার্নারের মেয়ে তাদেরই একজন। হোমসও কি তা-ই মনে করেন ? খুনের জায়গাটা পরীক্ষা করে তিনি বলেন, "খুনি লম্বা। ন্যাটা। তার ডান পা খোঁড়া। তার পায়ে ছিল পুরু-সুকতলা-লাগানো জুতো, গায়ে ছিল ছাইরঙা কোট। লোকটা সিগার খায়। তার পকেটে ছিল ভোঁতা পেনসিল-কাটা ছুরি। একটা পাথর দিয়ে সে খুন করেছে।" শুনে ইনসপেকটর লেস্ট্রেড বলে,"এ-সব কথা জুরিকে বোঝানো শক্ত হবে।" তারপর···

লেস্ট্রেড বলল বটে যে, হোমসের অনুমান আর সিদ্ধান্তের কথা ব্রিটিশ জুরিদের বোঝানো সম্ভব হবে না, কিন্তু হাসির ধরন দেখেই টের পেলুম, হোমসের সিদ্ধান্তে তার নিজেরই কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। হোম্‌স বলল, "বেশ তো, আপনি আপনার মতো কাজ করুন, আর আমিও আমার মতো কাজ করে যাই। আজ বিকেলে আমি খুব ব্যস্ত থাকব। তারপর সন্ধের কোনও গাড়িতে লণ্ডনে ফিরব।"

"সে কী! কাজ শেষ না করেই ফিরে যাবেন ?"

"না। কাজ তো শেষ হয়ে গেছে।"

"কিন্তু সমস্যাটার কী হল ?"

"তার তো সমাধান হয়ে গেছে।"

"খুনি কে ?"

"যাঁর কথা একটু আগে বললুম।"

"কিন্তু তিনি কে ?"

"এখানে এমন কিছু বেশি লোকের বসবাস নেই। তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না।"

লেস্ট্রেড খানিকটা হাল ছেড়ে দেওয়া ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। "মিঃ হোমস, আমি কাজের লোক। এখন লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ডান পা খোঁড়া ন্যাটা লোককে খুঁজে বেড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকেরা আমাকে পাগল বলবে।"

"ঠিক আছে। আমি কিন্তু আপনাকে সব কথা বলেছি। এই যে আপনার বাসা এসে গেছে। চলি। যাবার আগে আমি আপনাকে জানিয়ে যাব।"

লেস্ট্রেডকে নামিয়ে দিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলুম। আমাদের লাঞ্চ তৈরি ছিল। হোমস চুপ করে বসে রইল। হোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল যে, কোনও কারণে সে খুব অস্থির হয়ে পড়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর হোমস বললে, "ওয়াটসন, ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোসো। আমি একটা ছোটখাটো বক্তৃতা করব। তুমি সব শুনে বলো, কী করা উচিত। আমি তো বুঝতে পারছি না।"

"বেশ বলো।"

"তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, এই খুনের তদন্ত করতে গিয়ে জেমস ম্যাকার্থির জবানবন্দীর দুটো কথা আমাদের দু'জনেরই খুব অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। প্রথম হল, সে বলেছে যে তার বাবা কুইই বলে ডেকে উঠেছিল। কিন্তু তার বাবা জানত না, সে ফিরে এসেছে। তারপর জেমসের বাবা র‍্যাট বলেছিল কেন ? জেমসের বাবা কিন্তু আরও কিছু কথা বলেছিল। জেমস শুধু ওইটুকুই শুনতে পেয়েছিল। আমরা ধরে নিয়েছি যে, জেমস সত্যি কথাই বলেছে। তাই তার জবানবন্দী থেকে পাওয়া ওই দুটো সূত্রকে ধরেই আমাদের এগোতে হবে।"

"বেশ। তা হলে কুইই ডাকের কারণটা কী ?"

"জেমসের বাবা জানত না যে সে ব্রিস্টল থেকে ফিরে এসেছে। আর তা যদি হয় তো কুইই করে ম্যাকার্থি তার ছেলেকে ডাকেননি। তা হলে কাকে ডাকলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বিকেলে তাঁর একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে। যাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা করবার কথা ছিল, তাঁকে ডাকবার জন্যেই তিনি কুইই বলেছিলেন। নিজেদের মধ্যে কুইই বলে ডাকাডাকি করাটা অস্ট্রেলিয়াতেই চলে। তাই এর থেকে এ-কথাটা জোর করে বলা যায় যে, বস্কোম্ব ঝিলের ধারে ম্যাকার্থি যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন।"

"তা হলে র‍্যাট-এর ব্যাপারটা কী ?"

শার্লক হোমস পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে সেটিকে টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখল। "এটা ভিক্টোরিয়া অঞ্চলের একটা ম্যাপ। আমি এটা ব্রিস্টল থেকে আনিয়েছি।" হোমস ম্যাপের একটা জায়গা হাত দিয়ে চেপে রেখে আমাকে বলল, "পড়ো!"

আমি পড়লুম, "আর‍্যাট।"

"এখন পড়ো তো।" হোমস হাতটা সরিয়ে নিল।

"বালার‍্যাট।"

"ঠিক। এই কথাটাই ম্যাকার্থি বলতে চেয়েছিল। জেমস শুধু শেষটুকু শুনতে পেয়েছিল। উনি ওঁর খুনির পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। উনি বলতে চেয়েছিলেন যে, ওঁকে যে খুন করেছে তার বাড়ি বালার‍্যাট।"

"ওহ্। অদ্ভুত! আশ্চর্য! ভাবা যায় না।" আমি বলে উঠলুম।

"এটা তো জলের মতো সোজা ব্যাপার। তা হলে দেখছ যে আমি আমার তদন্তের বৃত্তটা ছোট করে এনেছি। তারপরে ওই ছাইরঙের জামার ব্যাপারটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জেমস সত্যি কথাই বলেছে। তা হলে এখন আমরা একজন লোকের পরিচয় পেলুম। ছাইরঙের কোট বা ওভারকোট-পরা একজন অস্ট্রেলীয়।"

"হ্যাঁ, ঠিক কথা," আমি বললুম।

"আরও একটা কথা। সে লোকটি নিশ্চয়ই এই অঞ্চলের লোক। কেননা কোনও বাইরের লোক যে এই অঞ্চলের পথঘাট ভাল চেনে না তার পক্ষে বস্কোম্ব ঝিলে যাওয়া শক্ত।"

"নিশ্চয়ই।"

"তারপর আমাদের আজকের অভিযান। আমি অকুস্থল দেখে নিশ্চিত হলুম। আর মাথা-মোটা লেস্ট্রেডকে খুনির পরিচয় দিলুম।"

"কী দেখে তুমি নিশ্চিত হলে?"

"তুমি তো আমার রীতিনীতি জানো। তুচ্ছ জিনিসকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেই কাজ হাসিল হয়।"

"লোকটা যে লম্বা তা নয় তুমি তার পায়ের ছাপের মধ্যেকার ফাঁকটা দেখে বুঝলে। তার পায়ের জুতো-জোড়া যে সাধারণ জুতো নয়, জুতোর ছাপ দেখে বোঝা গেল। কিন্তু লোকটা যে খোঁড়া এটা তুমি জানলে কেমন করে?"

"তার বাঁ পায়ের দাগটা যত গভীরভাবে বসে গেছে, ডান পায়ের ছাপটা তত গভীর হয়ে বসেনি। এর কারণ একটাই হতে পারে। সেটা হল লোকটি খোঁড়া।"

"বেশ। লোকটা যে ন্যাটা তা কী করে জানলে?"

"ওয়াটসন, করোনারের রিপোর্ট পড়ে তুমি ম্যাকার্থির আঘাত সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলে। আঘাত করা

আগামী সংখ্যা থেকে

শার্লক হোমসের নতুন গল্প

সিলভার ব্লেজ

হয়েছিল পিছন থেকে। অথচ আঘাতটা মাথার বাঁ দিকে। এটা কী করে সম্ভব? এটা সম্ভব হতে পারে যদি সে খুনি ন্যাটা হয়। খুনি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বাপ-ছেলের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে সব শুনেছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে খুনি সিগার খেয়েছিল। তুমি জানো যে বিভিন্ন রকমের তামাকের ওপর আমি রিসার্চ করেছি। তার থেকে আমি টের পেলুম কোন দেশের তামাক দিয়ে সিগারটা তৈরি। তারপর ওই জায়গায় আর একটু খোঁজাখুঁজি করতেই একটা সিগারের টুকরো পেয়ে গেলুম। সিগারটা রটারডামে তৈরি।"

"সিগার হোলডারটা?"

"সিগারের পড়ে থাকা টুকরোটায় দাঁত দিয়ে চেপে ধরার দাগ দেখতে পেলুম না। তাতেই বুঝলুম সিগার হোলডার ব্যবহার করা হয়েছে। সিগারের ধারটা কামড়ে ছেঁড়া হয়নি, ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে। কিন্তু কাটাটা বেশ পরিষ্কার নয়। তাতেই বুঝলুম পেনসিল কাটবার ভোঁতা ছুরি খুনির কাছে ছিল।"

"হোমস," আমি বললুম, "তুমি তো খুনিকে একেবারে বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে ফেলেছ। ওর আর পালাবার রাস্তা নেই। জেমস ছোকরাকে তুমি ফাঁসির দড়ি কেটে বের করে এনেছ। বুঝতে পেরেছি তুমি কার কথা বলতে চাইছ। খুনি হচ্ছে—"

"মিঃ জন টার্নার," হোটেলের বেয়ারা আমাদের ঘরের দরজা খুলে বললে।

ঘরে যিনি ঢুকলেন তাঁর চেহারা তাকিয়ে দেখবার মতো। ভদ্রলোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। চেহারায় বয়েসের ছাপ পড়েছে। তবে মোটা মোটা আঙুল আর লম্বা লম্বা হাত পা দেখলে বোঝা যায় যে ভদ্রলোকের গায়ে এখনও বেশ জোর আছে। ভদ্রলোকের আর একটা দেখবার মতো জিনিস ওঁর চোখ-মুখের ভাব। ওঁর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে বেশ শক্ত ধাতের মানুষ তিনি। ভদ্রলোকের মাথা ভর্তি উশকো-খুশকো চুল, বড় বড় দাড়ি আর অসম্ভব মোটা ভুরু। এক কথায় বেশ ভয়-পাওয়ানো জাঁদরেল চেহারা। তবে ডাক্তার হিসেবে আমার বুঝতে কষ্ট হল না যে, ভদ্রলোক খুব খারাপ আর কঠিন কোনও অসুখে ভুগছেন। ভদ্রলোকের মুখের রং ব্লটিং পেপারের মতো সাদা। শুধু ঠোঁট দুটো আর নাকের ডগাটা সামান্য নীল।

হোমস খুব নরমভাবে বলল, "আপনি দয়া করে এই সোফাটায় বসুন।.... আমার চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলেন তো?"

"হ্যাঁ। মোরান ঠিক সময়েই পৌঁছে দিয়েছে। আপনি লিখেছেন যে কেলেঙ্কারি এড়াবার জন্যে আমি যেন আপনার সঙ্গে হোটেলে এসে দেখা করি।"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয়েছিল যে আমি আপনার বাড়িতে গেলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে পারে।"

"কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন?" ভদ্রলোক হোমসের মুখের দিকে এক পলকের জন্যে তাকালেন। ভদ্রলোকের মুখ দেখে আমার মনে হল যে কেন হোমস তাঁকে এখানে ডেকে এনেছে তা তিনি জানেন।

"ব্যাপারটা নিহত চার্লস ম্যাকার্থিকে নিয়ে। আমি সব জেনে গেছি।"

ভদ্রলোক দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। তারপর একসময়ে নিজেই বলতে শুরু করলেন, "বিশ্বাস করুন, ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, জেমসের কোনও ক্ষতি আমি করব না। আমি ঠিক করেছি জেমসের বিচার শুরু হলেই আদালতে গিয়ে সব কথা বলে দেব।"

হোমস গম্ভীরভাবে বলল, "আপনার কথা শুনে সুখী হলুম।"

"আমি এখনই সব কথা বলতে পারতুম। কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবে বলতে পারিনি। আমাকে পুলিশে গ্রেফতার করে হাজতে নিয়ে গেলে ও বেচারা ভীষণ কষ্ট পাবে।"

"ব্যাপারটাকে অতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার কোনও দরকার নেই," হোমস বলল।

"আপনি কী বললেন?"

"আমি তো সরকারি পুলিশ নই। আর জেমসকে বাঁচাবার জন্যে আপনার মেয়েই আমাকে এই খুনের তদন্ত করবার জন্যে ডেকে এনেছিলেন। যাই হোক জেমসকে তো বাঁচাতে হবেই।"

মিঃ টার্নার বললেন, "আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। বহুদিন ধরে আমি ডায়াবিটিসে ভুগছি। ডাক্তারদের মতে আর বড় জোর মাসখানেক আমার আয়ু। জেলখানায় নয়, নিজের বাড়িতে আমি শেষ নিশ্বাস ফেলতে চাই মিঃ হোমস।"

হোমস সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল। একতাড়া

কাগজ আর কলম টেনে নিয়ে বলল, "আপনি আমাকে সত্যি কথাটা বলুন। আমি শুধু মাত্র মূল ঘটনাটা লিখে নেব, তারপর আপনি সেটায় সই করবেন। আর ওয়াটসন সাক্ষী হিসেবে সই করবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে নেহাত বাধ্য না হলে আপনার এই স্বীকারোক্তির কথা আর কাউকে জানাব না।"

"বেশ তবে তাই হোক। আমি কোর্টের শুনানির দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকব কি না সন্দেহ। ব্যাপারটা খুলে বলছি। কাজটা ভেবে ঠিক করতে যত সময় লেগেছিল বলতে অবশ্য মোটেই সময় লাগবে না।"

"আপনারা ম্যাকার্থিকে চিনতেন না। লোকটা আস্ত শয়তান। আমি বলছি। ভগবান যেন কখনও ওরকম লোকের খপ্পরে আপনাদের না ফেলেন। কুড়ি বছর ও আমার পিছনে লেগে আছে। আমার জীবন একবারে ছারখার করে দিয়েছে। কীভাবে আমি ওর পাল্লায় পড়লুম সেই কথাটা আগে বলি।

"১৮৬০ সালের কথা। আমার তখন বয়স কম। রক্ত গরম। উৎসাহ খুব। সব কিছুতেই একটা 'ঠিক আছে দেখা যাবে' গোছের ভাব। এই সময় আরও অনেকের মতো পয়সা রোজগারের ধান্দায় আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু ভাগ্য-দোষে আমি বদ সঙ্গে পড়ে গেলুম। তারপর যা হয়, সঙ্গ-দোষে আমিও অসৎ-পথ ধরে ফেললুম। সৎ-পথে পরিশ্রম করে পয়সা রোজগারের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে রাহাজানি করতে লাগলুম। আমাদের দলে সবসুদ্ধ ছ'জন ছিল। আমাদের পয়সা উপায়ের রাস্তা ছিল গাড়ি আটকে টাকা-পয়সা লুঠ করা। আমার নাম হয়েছিল বালার‍্যাটের ব্ল্যাক জন।

"একবার খবর পেলুম যে গাড়িতে করে বালার‍্যাট থেকে মেলবোর্নে সোনা চালান যাবে। আমরা সেই রাস্তার এক জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে রইলুম। তারপর গাড়িটা আসতেই সেটাকে ঘিরে ফেললুম। গাড়িতে ছ'জন সৈন্য ছিল। আমাদের দলেও আমরা ছ'জন ছিলুম। খুব জোর লড়াই হল। আমরা ওদের চারজনকে খতম করে দিলুম। অবশ্য আমাদের দলেরও তিনজন মারা গেল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সোনা-ভর্তি থলিগুলো হাতিয়ে নিয়ে আমরা সেখান থেকে চম্পট দিলুম। ঐ গাড়িটা চালাচ্ছিল চার্লস ম্যাকার্থি। আমি ওর রগে পিস্তল ঠেকিয়ে ওকে আটকে রেখেছিলুম। পরে আমার অনেকবার মনে হয়েছে যে সেদিন ওকে দয়া করে না ছেড়ে দিয়ে গুলি করে শেষ করে দিলেই ভাল হত। যাই হোক অনেক সোনাদানা পেয়ে আমরা তো বড়লোক হয়ে গেলুম। তখন আমি ওদেশ ছেড়ে চলে এলুম। তবে এখনও ওখানকার লোকেরা 'বালার‍্যাট' দলের কথা ভুলে যায়নি। ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে জমিজমা ঘরবাড়ি কিনে এইখানে থিতু হয়ে বসলুম। কিছু দিন পরে আমার বিয়ে হল। আমার স্ত্রী অল্প বয়েসে মারা যান। তখন আমার মেয়ে অ্যালিস খুব ছোট। বেশ ভালই ছিলুম, এমন সময় ম্যাকার্থি কোথা থেকে এসে হাজির হল।

"একদিন ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে লণ্ডন গেছি, হঠাৎ রিজেন্ট স্ট্রিটে ম্যাকার্থির সঙ্গে দেখা। আমাকে ঠিক চিনেছে। আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বলল, 'জ্যাক, আমার আর আমার ছেলের ভরণপোষণের সব ভার তোমাকে নিতে হবে। যদি রাজি না হও তো দ্যাখো মোড়ের কাছেই পুলিশ পাহারা রয়েছে। আর তুমি তো ভালরকমই জানো যে, ইংল্যাণ্ডে ন্যায়বিচার তো পাওয়া যায়ই আর অপরাধীরও শাস্তি হয়।'

"সেই দিন থেকে ওরা আমার ঘাড়ে চেপে বসল। ওর হাত থেকে আমার রেহাই ছিল না। সব সময়ে আমার কাছে ঘুরঘুর করত। ওর যখনই যা দরকার তক্ষুনি সেই জিনিসটা ওকে জোগাড় করে দিতে হত। এরই মধ্যে অ্যালিস বড় হতে লাগল। ওর ছেলেও বড় হল। একদিন লোকটা আমার কাছে একটা প্রস্তাব করল। ওর কথা শুনে আমি তো হতবাক। বলে কী? ওর ছেলের সঙ্গে অ্যালিসের বিয়ে দিতে হবে। আমি জানি জেমস ছেলে ভাল। তবু এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি রাজি হলুম না। ও আমাকে শাসাতে লাগল। আমি ওকে যা পারে করতে বললুম। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল এ-ব্যাপারে আরও আলোচনার জন্যে আমরা ঝিলের ধারে দেখা করব।

"সেখানে গিয়ে দেখি চার্লস আর জেমস নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। চার্লসের কথা শুনতে শুনতে রাগে আমার মাথা ঝনঝন করতে লাগল। শেষকালে এই শয়তানটার খপ্পরে অ্যালিস পড়বে? ওটার হাত থেকে অ্যালিসকে বাঁচাবার কোনও রাস্তাই কি নেই? আমার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে। আমি মনকে শক্ত করলুম। বিশ্বাস করুন, ওকে মারবার সময় আমার এক ফোঁটা কষ্ট বা অনুশোচনা হয়নি। আমার মনে হল যে বিষাক্ত কীটকে মারলুম। মিঃ হোমস, যে কাজ করেছি তার জন্যে আমার মনে কোনও দুঃখ নেই। প্রয়োজন হলে আমি ফের এই কাজ করব। এই হচ্ছে আমার কাহিনী।"

একটু চুপ করে থেকে হোমস গম্ভীর গলায় বলল, "আমি আপনার কাজের ভালমন্দ বিচার করতে চাই না। তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এরকম সমস্যায় আমাদের আর যেন পড়তে না হয়।"

মিঃ টার্নার বললেন, "সে কথা থাক। এখন আপনি কী করতে চান?"

"কিছুই না। শিগ্‌গির হয়তো আপনাকে আরও বড় আদালতের সামনে বিচারের জন্যে দাঁড়াতে হবে। সেখানেই আপনার বিচার হবে। আপনার এই স্বীকারোক্তি আমি আমার কাছে রেখে দেব। জেমসকে যদি আর কোনও উপায়ে বাঁচাতে না পারি তবেই আমি এটা আদালতে পেশ করব।"

"ঠিক আছে। তা হলে চলি। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।" মিঃ টার্নার প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন।

শেষ অবধি অবশ্য হোমসকে টার্নারের গোপন কথা ফাঁস করতে হয়নি। সরকারি পক্ষের উকিল জেমসের বিরুদ্ধে যেসব প্রমাণ দাখিল করেছিলেন তার ভেতর অনেক গলদ ছিল। অন্য লোকের চোখে সে গলদ ধরা না পড়লেও হোমসের চোখ এড়ায়নি। হোমস সেগুলো জেমসের উকিলকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। আর তাতেই জেমস বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। টার্নার অবশ্য এর পর আরও সাত-আট মাস বেঁচে ছিলেন।

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

জেনে নাও

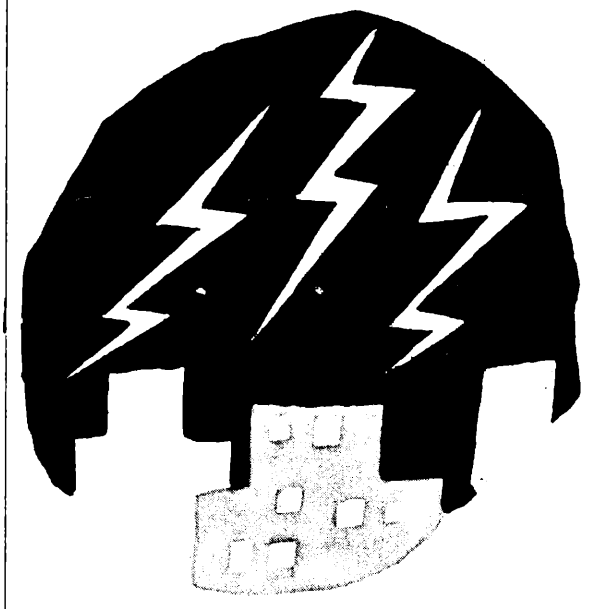

আলো ও শব্দের গতি

বর্ষাকালে মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখি, বাজ পড়ার শব্দ শুনতে পাই। বিদ্যুৎ যখন চমকায়, বাজ তখনই পড়ে। কিন্তু আকাশের কোণে কোণে বিদ্যুতের চমক দেখার পরে বাজ পড়ার শব্দ শোনার জন্যে কখনও-কখনও বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয়। কেন ? বিদ্যুৎ যখন চমকায় বাজ পড়ার শব্দ তখনই শুনতে না পাওয়ার কারণ কী ?

বিদ্যুতের চমক মানে আলোর একটা বিচ্ছুরণ। আলো ছুটে চলে সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বা ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫০০ কিলোমিটার অর্থাৎ বলতে গেলে বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তা দেখতে পাই। কিন্তু শব্দ চলে আলোর তুলনায় অনেক ধীরে, সেকেণ্ডে মাত্র ৩৩২ মিটার অর্থাৎ প্রায় ১১২০ ফুট। এ খরগোশের দৌড় আর কচ্ছপের হাঁটা নয়, তার চেয়েও অনেক অনেক কম।

সেইজন্যে যদি ১৫০০ মিটার দূরে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখা যায়, তা হলে সেই চমক দেখতে পাওয়া যাবে সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু বাজ পড়ার শব্দ কানে পৌঁছবে প্রায় ৪/৫ সেকেণ্ড পরে। ১৫০০ মিটারের বদলে ৩০০০ মিটার হলে বিদ্যুতের চমক দেখার বেলায় সময়ের হেরফের বোঝা যাবে না, কিন্তু বাজের শব্দ কানে এসে পৌঁছতে প্রায় ৯ সেকেণ্ড লেগে যাবে।

সময়টা নেহাত কম নয়।

অনেক সময়ে আবার বিদ্যুৎ চমকানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাজ পড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তখন বোঝা যায়, বাজ খুব কাছাকাছি কোথাও পড়েছে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

ডাক্তারবাবু বলছেন

শীতের পোশাক

ভালরকম শীত পড়ে গেছে। তোমাদের পরীক্ষাও শেষ। এবার হৈহৈ করে ঘুরে বেড়ানো, দলবেঁধে চড়ুইভাতি করতে যাওয়ার আনন্দ। কিন্তু এসব করতে হলে শরীরটাকে সুস্থ রাখা খুবই দরকার।

স্নান-ব্যায়াম যেমন করছ তেমনি করে যাবে। ঠিকমতো গরম জামা পরবে। গরম জামা না পরলে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস শরীরে লেগে চামড়ার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা ঢুকে সমস্ত শরীরকে সংকুচিত করবে ও শরীরের কোষগুলো গরম হয়ে স্ফীত হবার চেষ্টা করবে। এর ফলে শরীরে নানারকম অস্বস্তি দেখা দেবে।

শীতল অনুভূতি শরীরের মধ্যে ঢোকে একরকমের বিশেষ কোষের মাধ্যমে। এই কোষের নাম মেমব্রেন অব ক্রজ (Membrane of Krauz)। এই কোষগুলি চামড়ার সব জায়গাতেই আছে, তবে সবচেয়ে বেশি আছে হাত পা কান গলা মুখ ও নাকে। সেইজন্যে দেখবে গরম সোয়েটার বা কোট-প্যান্ট পরে যত না শীত কাটে, একটা মাফলার গলায় কানে মাথায় জড়িয়ে দিলে শীত একেবারে লাগে না বললেই হয়। মেয়েরাও গরম জ্যাকেট, স্কার্ট, ফুল মোজা পরবে। যারা শাড়ি পরো, তারা উলের ব্লাউজ স্কার্ফ কিংবা শাল গায়ে দিতে পারো।

বিলিতি সিন্থেটিক পোশাক পরবে, না আমাদের দেশের উলের পোশাক পরবে, এ-নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করেছে। আমার মতে, আমাদের দেশের উলের পোশাক পরাই ভাল। উলের পোশাকের ফাঁক দিয়ে খানিকটা বাতাস শরীরে লাগে আর তাতে চামড়া সতেজ থাকে। সিন্থেটিক পোশাকে বাতাস ঢুকতে পারে না। যেখানে তুষারপাত হয়, ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে, সে-সব জায়গায় ছুঁচ-বেঁধানো ঠাণ্ডা বাতাস থেকে শরীর বাঁচানোর জন্যে ওই রকম পোশাক পরতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে তো তুষারপাত হয় না বললেও চলে, তাই ওই ধরনের পোশাক পরার দরকার নেই। কিন্তু উলের পোশাকে খানিকটা বাতাস শরীরে লাগছেই, সেইজন্যে যখন পোশাক খুলবে তখন শরীরে আচমকা ঠাণ্ডা লাগবে না, ফলে অসুখবিসুখ করবে না। তবে একটা কথা, সব জামাকাপড় রোদে দিয়ে তারপর পরবে।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী পঙ্গু। ছেলে সায়ন স্কুলের ছুটিতে বাগানে এসেছিল। বেওয়ারিশ ঘোড়া তাকে নিয়ে ভুটানের জঙ্গলে ঢোকে। সেখানে সুধাময় সেন তাকে বিছের কামড় থেকে বাঁচান। তিনি নাকি নেতাজির ফৌজে ছিলেন, ইংরেজদের হাতে বন্দী হন, পালিয়ে জঙ্গলে আছেন, বাইরের জগতের খবর রাখেন না। সায়নকে তিনি যে জংলি মানুষদের ডেরায় নিয়ে যান, তাদের পোশাকে সেই অগ্নি-চিহ্ন, যা দেখে বুধুয়া-বুড়ো ভয় পেয়েছিল। অন্যদের চোখ এড়িয়ে গুহায় ঢুকে সায়ন আক্রান্ত হয়। উদ্ধার পেয়ে দেখে, দুজন বন্দী লোকের একজনকে মেরে ফেলা হল। গুপ্ত মালের হদিস দেবার জন্যে অন্যজনকে এক অশ্বারোহী নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে দুজনেই মারা পড়ে। সায়ন বোঝে, এরা চোরাকারবারি, এবং সুধাময়ই এদের নেতা। মৃত অশ্বারোহীর ঘোড়ায় উঠে সে পালায়। ভাগ্যক্রমে সে সর্পাঘাত থেকে বেঁচেছে। তারপর···

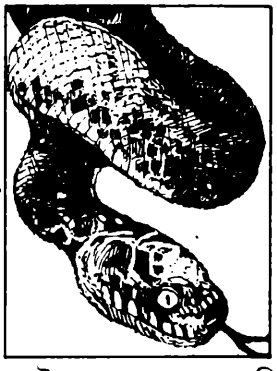

বারংবার রিভলভারের দিকে মন চলে যাচ্ছে। এর ভেতরে গুলি আছে কি না কিংবা ছোঁড়বার সময় ঠিক কী কী কাজ করতে হয় সায়ন জানে না। সিনেমায় সে দেখেছে কীভাবে গুলি ছোঁড়া হয়। ওই ট্রিগারটায় চাপ দিলেই কি গুলি বের হবে? জিনিসটা যার সে কি ছোঁড়ার জন্যে তৈরি করে রেখেছিল? একটু দাঁড়িয়ে যন্ত্রটাকে ভাল করে দেখে নিল সে। খুলতে সাহস হচ্ছিল না। একবার ট্রিগার টিপে পরীক্ষা যে করে নেবে তারও উপায় নেই। যদি সত্যি-সত্যি গুলি বের হয়, তা হলে যে আওয়াজ হবে তাতে তাকে খুঁজে বের করতে ওদের কোনও অসুবিধে হবে না। অতএব অস্ত্রটাকে হাতে পাওয়ার পরও আর এক ধরনের অসহায়তা ক্রমশ আচ্ছন্ন করছিল সায়নকে।

ঘোড়াটা চলছে দুলকি চালে। মাথার ওপর ঘন ডালপাতার আড়াল। খুব দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে। সায়ন বুঝতে পারছিল তারা অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। নদীর জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ জঙ্গল পাতলা হয়ে গেল। শুকনো পাথুরে একটা উপত্যকা চোখে পড়তেই সে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে দিল। এখনও যে আলোটুকু পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে তাতে তাদের স্পষ্ট দেখা যাবে আর-একটু এগিয়ে গেলে। কেউ তাকে লক্ষ করবে কি না জানা নেই, কিন্তু সাবধান হতে দোষ কী! সে তাকিয়ে দেখল এই বিশাল বন ক্রমশ নীচে নেমে গেছে। আকাশ এখানে অনেক বড়। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। শুধু জঙ্গল এবং শেষমেশ সবুজে-কালোয় মেশামেশি। সায়ন বুঝতে পারছিল না কোথায় পৌঁছনো যাবে ওই ঢালু দিক দিয়ে নেমে গেলে।

একসময় রবার দিয়ে মুছে ফেলার মতো দিনের আলো ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। যদিও আকাশে তারারা চটপটে পায়ে জায়গা নিয়ে নেওয়ায় আর-এক রকমের আলো নামল চরাচরে, কিন্তু অন্ধকারের গা-ছমছমে ভাবটা যাচ্ছিল না। ঠিক তখনই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। বেশ কয়েকটা ঘোড়া ছুটে আসছে উলটো দিক দিয়ে। সেই শব্দে সায়নের ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে পা ঠুকতে শুরু করল। ন্যাড়ামাথা লোকগুলো এদিকে কেন আসছে ঠাহর করতে না পেরে সে জঙ্গলের মধ্যে আর-একটু সরে এল। এবং তখনই ভয় হল, ওরা নিশ্চয়ই তার অস্তিত্ব বুঝতে পেরেছে। নিশ্চয়ই সারা দিন খুঁজেছে ওরা। সুধাময় সেন কি নির্দেশ দেননি তাকে খুঁজে বের করতে? এই জঙ্গল তো ওদের চেনা, কিন্তু তার হদিস পেতে এত দেরি হল কেন? যাই হোক, সে সহজে ধরা দেবে না ওই শয়তানদের হাতে। দুটো মানুষকে যেভাবে খুন করেছে ওরা, তাতে নিজের অবস্থা ধরা পড়লে কী হবে বুঝতে বাকি নেই। সায়ন ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা একটা গাছের ডালে বেঁধে ঘোড়াটার পিঠে হাত রাখতেই সে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল। শব্দটা এগিয়ে আসছে।

সায়ন আর দেরি না করে দ্রুত জায়গা ছেড়ে বাঁ দিকে এগিয়ে গেল। পায়ের তলায় শুকনো পাতা মচমচিয়ে ভাঙছে। অন্ধকারে একটা ঝাঁকড়া শক্ত গাছে উঠে বসতেই সে পরিষ্কার দেখতে পেল। পাতলা অন্ধকারের চাদর ভেদ করে চারটে ঘোড়সওয়ার এসে দাঁড়িয়েছে পাথুরে উপত্যকায়। সায়ন আশ্বস্ত হল, ওরা কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে না। বরং ঘোড়া থেকে নেমে বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে জঙ্গলের পাশে রাখা স্তূপের দিকে এগিয়ে গেল। সায়ন লক্ষ করল সেগুলো কাঠ নয়, পাথর নয়, খুব ভারী কিছু নয়। চারটে লোক নিঃশব্দে সেগুলো বয়ে এনে একটি জায়গায় সাজাতে আরম্ভ করল। ওরা কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করছে না। এমনকী, তাদের ঘোড়াগুলোও অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সায়ন বুঝতে পারছিল না ওরা কী করছে। চারজনের একজন কাজ শেষ হলে ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর ঘোড়ার শরীরে ঝুলিয়ে-রাখা একটা পাত্র এনে সাজানো জায়গায় ছড়িয়ে দিল। এবার দ্বিতীয়জন খুব সন্তর্পণে দেশলাই জ্বেলে দিল সেখানে। মুহূর্তেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল জায়গাটা। সায়ন সেই আগুনের আলোয় দেখল শকুনের মতো ন্যাড়ামাথা চারটে মানুষ হিংস্র চোখে সেই আগুনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। তারপর এক মুহূর্তেই ঘোড়াগুলো মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

আগুনটা বাড়ছে। তার তাপ টের পাচ্ছিল সায়ন। পাখিরা এর মধ্যেই চেঁচামেচি করে আশপাশের গাছ থেকে উড়ে গেছে। উঁচু গাছের মাথায় উঠে এসেছে আগুনের শিখা। এবং তখনই সায়নের খেয়াল হল। নির্দিষ্ট জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার পর সেটাকে ইংরেজি 'টি' অক্ষরের মতো দেখাচ্ছে। একটা দাঁড়ির ওপর লম্বা ছাদ। চকিতে মনের মধ্যে বুধুয়া-বুড়োর সন্ত্রস্ত মুখ ভেসে উঠল। এই আগুনটাকেই বুধুয়া-বুড়ো শয়তানের নির্দেশ বলে মনে করত। টি অক্ষরের মানেটা বুধুয়া-বুড়ো বলেছিল, ভগবান আসছে, পালাও। বুড়োর ভীত মুখটা মনে করে হেসে ফেলল সে। বুধুয়া যাকে শয়তানের নির্দেশ বলে মনে করত তাদের সে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু ভগবান আসছে, পালাও—এ নির্দেশ কী

কারণে ? কে ভগবান ? আর এই নির্দেশই বা দেওয়া হচ্ছে কাকে ? কিন্তু পাহাড়ের এই উঁচু এবং ন্যাড়া জায়গায় আগুন জ্বেলে নির্দেশ দেওয়া হয়। আর এই আগুন তাদের চা-বাগানের বাংলোয় দাঁড়িয়ে যখন দেখা যায় তখন দূরত্বটা নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়। তার মনে হল, এই সময়েও বুধুয়া-বুড়ো আগুনটা দেখে শিউরে উঠছে। কিন্তু যে ব্যাপারটা লক্ষ করার সেটা হল দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের শিখাটা নেমে আসছে না। শুধু কাঠ হলে এমনটা হত না। ওরা যেটা মিশিয়েছে সেটা পেট্রল কিংবা স্পিরিটজাতীয় কিছু এবং মিশেছে রবার বা ফোমে। কারণ বিশ্রী পোড়া গন্ধ লাগছে নাকে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর আগুন কমে এল। পাথরের ওপর ধিকিধিকি জ্বলছে সেটা। যেন একটা টি শুয়ে আছে। সায়ন নেমে এল গাছ থেকে। তারপর সন্তর্পণে ঘোড়াটার পাশে এসে দাঁড়াল। এবং তখনই সে চমকে উঠল। ঘোড়াটা শুয়ে আছে। ঠিক শোওয়া বললে ভুল হবে। ওর মুখ গলা দড়িতে আটকানো বলে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। পেছনের জোড়া পা ভাঁজ করা অবস্থায় শরীরটা মাটিতে গড়াচ্ছে। এক পলকেই সায়ন বুঝতে পারল, প্রাণীটা মৃত। দৌড়ে সরে এল সে। কে ওকে মারল। সে স্পষ্ট দেখেছে চার ঘোড়সওয়ার এদিকে মোটেই আসেনি। তা ছাড়া ওরা নিজেদের ঘোড়াটাকে এমনভাবে মারবে না। এই পাহাড়ে ঘোড়া নিশ্চয়ই অত্যন্ত দামি পশু। মরে যাওয়ার সময় ঘোড়াটা সামান্য চিৎকারও করেনি। এমন নিঃশব্দে কেন মরে গেল ঘোড়াটা। তারপরেই সায়নের মনে হল ওকে সাপে কামড়ায়নি তো ? তা হলে সে এমন সাপ যার বিষে একটা ঘোড়াও নিঃশব্দে মরে যায়। সায়নের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ছটফটিয়ে উঠল। ভাগ্যিস সে ঘোড়াটার পিঠে ছিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হল ঘোড়াটা যদি সামান্য শব্দ করে মরত তা হলে অশ্বারোহীরা টের পেয়ে যেত সে এখানে এসেছে। মৃত্যুর সময়েও ঘোড়াটা তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

এই জঙ্গলে যে বিষধর সাপ আছে তার প্রমাণ আগেই পাওয়া গেছে। কিন্তু তারা যে এমন মারাত্মক বুঝতে পারেনি। সাপ ছাড়া এভাবে চোরের মতো কেউ মৃত্যুকে ডাকতে পারে না। আতঙ্কিত সায়ন প্রায় নিভে-আসা আগুনের সামনে এসে দাঁড়াল। রবারজাতীয় কিছুতে পেট্রল ঢেলেছে বোধহয়। গন্ধ এত তীব্র যে সামনে দাঁড়ানো কষ্টকর। তবু এই জায়গাটা নিরাপদ। অন্তত সাপ আগুনকে ভয় পায়। কিন্তু ওরা যদি আগুনের ওপর নজর রাখে, তা হলে তো তাকেও দেখতে পাবে। সায়ন আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। শরীরে এবং মনে সে প্রচণ্ড ক্লান্ত। এখন যা হয় হোক, সে ওই অন্ধকার জঙ্গলে একা পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না। ধিকিধিকি আগুনের কাছাকাছি পরিষ্কার জায়গা দেখে সে পাথরের ওপর বসে পড়ল। তাত লাগছে, কিন্তু সেটা বেশ আরামপ্রদ। মাথার ওপর আকাশভর্তি তারা। ওরা যেন ক্রমশ বেঁকে পায়ের তলায় নেমে গেছে।

উৎকট গন্ধ ক্রমশ অভ্যাসে এসে গেলে সহনীয় হয়। সায়নের সেদিকে খেয়াল ছিল না। সুধাময় সেন কি তাঁর

দলবল নিয়ে এই পাহাড় ছেড়ে চলে যেতে চান ? ওরা নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে, নইলে পালাবার কথা বলত না। কিন্তু সে কী করে চা-বাগানে ফিরে যাবে ? বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনও পথই তো তার জানা নেই।

একগাদা পাখি একসঙ্গে ডাকলে মাছের বাজারকেও হার মানিয়ে দেয়। সায়ন ধড়মড় করে উঠে বসে দেখল, পাতলা আলো ছড়িয়েছে জঙ্গলের ওপর, পাহাড়ের গায়ে। আর আশপাশের গাছে দল বেঁধে ঝগড়া করছে ভোরের পাখিরা। সামনে জমে-থাকা ছাইগুলো এখনও টি অক্ষরটিকে ধরে রেখেছে। অসাড়ে ঘুমিয়েছে সে, কখন রাতটা ফুরিয়েছে টের পায়নি। ঘুমটা তার উপকার করেছে, কারণ খিদে ছাড়া অন্য কোনও ক্লান্তি নেই শরীরে। চটপট সে খোলা জায়গা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে সরে পড়ল। এতক্ষণ যে কেউ তাকে দেখতে পায়নি এই রক্ষে ! সায়ন সন্তর্পণে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘোড়াটা নেই। অথচ দড়ির প্রান্তটা ছেঁড়া অবস্থায় ঝুলছে গাছের ডালে। আর ওখান থেকে কোনও ভারী জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ রয়েছে ওপাশে। সায়ন আর দাঁড়াল না। কোনও বড় জানোয়ার ঘোড়াটাকে খেয়েছে। সেই জানোয়ার ঘুমন্ত অবস্থায় তাকেও খেতে পারত।

সায়ন প্রাণপণে, যতটা সম্ভব জঙ্গলে দৌড়নো যায় ততটা দৌড়ে জায়গাটা ছেড়ে পালাতে চাইল। নিশ্চয়ই ওই ভারী ঘোড়াটাকে নিয়ে জানোয়ারটা বেশি দূর যায়নি, যেতে পারে না। এই সময় হঠাৎ চোখ তুলে সামনে তাকাতেই তার দুটো পা জমে গেল। জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে খাড়া পাথুরে পাহাড় উঠে গেছে। সেই পাহাড়ের চুড়োটা খুব বেশি উঁচু নয়। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, চুড়োটায় চাতাল আছে। কিছুক্ষণ তাকানোর পর সায়নের স্পষ্ট মনে হল ওটাই সুধাময় সেনের আস্তানা। ওখানেই সে আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু কোনও মানুষকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সুধাময় সেন তাকে যে-দিকটায় যেতে নিষেধ করেছিলেন, সেটাই কি এই দিক ? অগ্নি-সংকেত পাঠানো হয় এই দিক থেকে বলেই কি সুধাময় সেন আড়াল করতে চেয়েছিলেন ?

যত কাছে এগোতে লাগল সায়ন, তত জলের শব্দ কানে আসতে লাগল। এই শব্দ তাকে আরও নিশ্চিত করল জায়গাটা সম্পর্কে। এখন আর চাতালটাকে দেখা যাচ্ছে না। অনেক নীচে নেমে এসেছে সে। ওপরে কেউ আছে কি না তাও জানা নেই। কিন্তু এই জঙ্গল ভেদ করে নদীর দিকে যাওয়াটাও মুশকিল।

প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক পরে সায়ন সেখানে পৌঁছল যেখানে নদীর জল কিছুটা ঢুকে বালির মধ্যে মুখ গুঁজেছে। সায়ন চিনতে পারল। ওখানেই সে প্রথম দিন বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল এবং সুধাময় সেন তাকে উদ্ধার করেছিলেন। একটা গাছের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। একমাত্র পাখির ডাক আর জলের শব্দ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। সায়ন লক্ষ করল, সেই দড়িটাকে দেখা যায় কি না। এখান থেকে ঠাহর করা মুশকিল। ওই চাতাল এবং গুহা সায়নকে টানছিল। ওখানে গেলে খাবার পাওয়া যাবে, এ-কথা ঠিক, কিন্তু আর একটা জিনিস তাকে আকর্ষণ করছিল। অন্যের

ডায়েরি পড়া উচিত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুধাময় সেনের ডায়েরিটা তার জানা দরকার। ওটা না জানলে সুধাময় সেনের সম্পর্কে সে কোনও কথাই চা-বাগানে ফিরে গিয়ে বলতে পারবে না। যদি সুধাময় সেন এখন ওখানে থাকেন তা হলে ! এক ধরনের জেদ ওর মনে শেকড় গাড়ল। উলটে সে-ই অভিযোগ করতে পারে, তাকে ফেলে রেখে তিনি কেন চলে এলেন ? মুখোমুখি নিশ্চয়ই সুধাময় সেন তাকে খুন করতে পারবেন না। আর সেরকম চেষ্টা করলে তার সঙ্গেও অস্ত্র আছে !

কোনও মানুষের অস্তিত্ব না পেয়ে সে ধীরে ধীরে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল এবং তখনই দেখতে পেল বালির ওপর অনেক জুতোর দাগ। দাগগুলো বেশ টাটকা। সে বুঝতে পারছিল না কী করবে। ন্যাড়ামাথা ঘোড়সওয়াররা কি এখানে এসেছে ? কিন্তু কোনও ঘোড়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তো ! সে ধীরে ধীরে পাহাড়টার নীচে পৌঁছে উপরের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। নিঃশব্দে হনুমানটা তাকে দেখছে। তারপর চোখাচোখি হতেই সেটা লাফিয়ে উপরে উঠে গেল।

দ্রুত সরে যেতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সায়ন। ওপর থেকে দড়িটা নেমে আসছে সরসর করে। ওই দড়ি না বেয়ে উঠলে চাতালে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। আর দড়ির পাক ছাড়ছে হনুমানটা। সুধাময় সেন ধারেকাছে নেই। ছুটে এসে দড়িটাকে ধরে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগল সায়ন।

(ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

ধাঁধা

এবারের নতুন ধাঁধাটা ছোট্‌কার নিজের চোখে দেখা কোনও দৃশ্য থেকে তৈরি না কি কল্পনা দিয়ে বানানো বলা কঠিন। তবে, দু-দিনের ট্যুর থেকে ফিরে ছোট্‌কা যেভাবে রসিয়ে-রসিয়ে বলল ধাঁধাটা, তাতে মনে হয়, যাবার পথে কিংবা ফেরার পথে রেলকামরায় হয়তো বা সত্যিই দেখেছে ছোট্‌কা একালের কয়েকজন লেখককে। আর সেই থেকেই ধাঁধাটা বানিয়েছে।

তবে, ছোট্‌কার ব্যাপার তো, নিশ্চিত করে কিছু বলা শক্ত। রেলকামরায় বসে জানলা দিয়ে পথের চলমান দৃশ্য দেখতে দেখতেও এমন একটা ধাঁধা বানিয়ে ফেলা ছোট্‌কার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার নয়।

ব্যাপার যাই হোক, ধাঁধাটা বেশ জমাটি। সুতরাং সেটাই বলে ফেলি আগে।

প্রথম ধাঁধা ॥ রেলকামরায় মুখোমুখি বসে আছেন ছ'জন তরুণ লেখক। এপাশে তিনজন, ওপাশে তিনজন। প্রত্যেকে নামী, প্রতেকের লেখার ক্ষেত্র আলাদা। একজন লেখেন উপন্যাস, একজন প্রবন্ধ, একজন লেখেন হাসির গল্প, একজন নাটক লেখেন, একজন লেখেন শুধুই ভ্রমণকাহিনী, একজন লেখেন কবিতা। মোটামুটি এই হল ছ'জনের পরিচয়। ছ'জনের পদবী ছ'রকম। গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, সরকার, মিত্র ও চক্রবর্তী। এটা অবশ্য এলোমেলোভাবে বলা হল। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে অন্য লেখকের লেখা কোনও-না-কোনও বই। অর্থাৎ কেউই নিজের লেখা বই দেখছেন না।

গঙ্গোপাধ্যায় পড়ছেন ভ্রমণকাহিনী। মিত্রমশাই উলটে দেখছেন ঠিক তাঁর উলটোদিকের মুখোমুখি বসা কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ। ভ্রমণকাহিনীকার ও হাসির গল্প লেখকের মাঝখানে বসে আছেন মুখোপাধ্যায়, তাঁর হাতে প্রবন্ধের বই। ভ্রমণকাহিনীকারের উলটোদিকে বসেছেন প্রাবন্ধিক। চট্টোপাধ্যায় পড়ছেন নাটক। মুখোপাধ্যায়ের অন্য-এক পরিচয়, তিনি ঔপন্যাসিকের মামাতো ভাই। সরকার বসেছেন নাট্যকারের পাশে। ঔপন্যাসিক বসেছেন এক কোণে,, তাঁর প্রবন্ধ পড়তে ভাল লাগে না। চট্টোপাধ্যায়ের আসন ঔপন্যাসিকের মুখোমুখি। সরকারের হাতে হাসির গল্পের সংকলন। চক্রবর্তী কবিতা পড়েন না। যেমন, নাটক পড়েন না মুখোপাধ্যায়।

এ-থেকে বলতে পারো, কে কী লেখেন ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ ফুল ওলটালে পাখি ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ 'রাশুপরম'-এর জট ছাড়ালে কার ছদ্মনাম মিলবে ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) মানবপুত্র। যিশুখৃস্টকে নিয়ে লেখা। (২) ২১৯৭৮×৪=৮৭৯১২। (৩) ১৯৮৫ বছর আগে।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

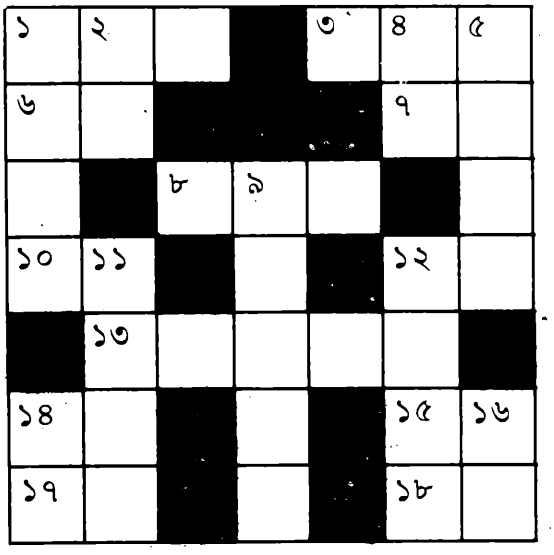

সংকেত : পাশাপাশি : (১) খাস্তা-নরম দু'রকমেরই হয়। (৩) বিকশিত। (৬) ঘোড়ায় চড়ে খেলতে হয়। (৭) দেবরাজ। (৮) ভারতের এক প্রাচীন রাজ্য। (১০) গুণবিশেষ। (১২) পার্বত্য জাতি। (১৩) নদী যার মা। (১৪) ধ্বনি। (১৫) বুকের পাটা। (১৭) গাল। (১৮) জলাভূমি।

উপর-নীচ : (১) যে-নদ বিখ্যাত কবির স্মৃতি বহন করছে। (২) উনুন। (৪) যে-মাছের জান খুব শক্ত। (৫) পাঁচ নদীর একটি। (৯) রামায়ণে বর্ণিত বিখ্যাত পর্বত। (১১) দাঁড়িপাল্লা। (১২) নাকের অলংকার। (১৪) হাতি সাপ, আরেব্বাপ ! (১৬) যা থেকে তেল।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

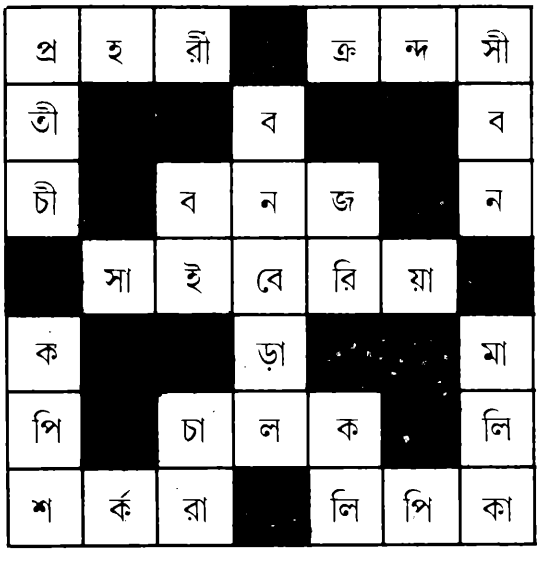

রঞ্জন

মজার খেলা

প্রদীপের তেল পুড়িয়ে কীভাবে কাজল তৈরি হয়, সে তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু আগুন না জ্বেলে, শুধু আড্ডায় বসে, হঠাৎ যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, তেলকে কালি করতে পারো ? তা হলে ?

তা হলে সে নিশ্চিত অবাক হয়ে ভাববে, আগুন না জ্বেলে তেলকে কালি করা অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু অসম্ভব যে নয়, সেটা টেবিলে বসেই তক্ষুনি প্রমাণ করে দেওয়া যায়।

কীভাবে যায়, শুনবে ?

এর জন্য অবশ্য পকেটে রাখতে হবে, সাতটা টুথপিক। কিংবা জোগাড় করে আনতে হবে সাতটা ব্যবহার-করা পোড়া দেশলাই-কাঠি।

সেই কাঠি সাতটাকে প্রথমে টেবিলের উপর নীচের ছবির মতন সাজাও—

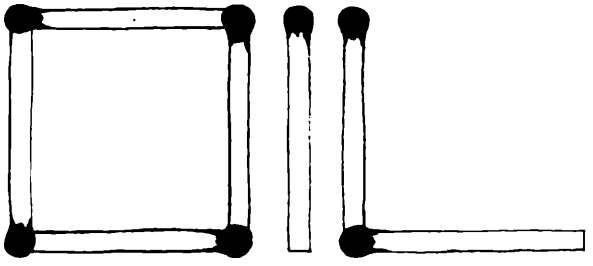

কী লেখা হল বলো তো ? হ্যাঁ, ইংরেজিতে লেখা অয়েল, মানে তেল।

এবার কাঠিগুলোকে সাজাও অন্যভাবে, নীচের ছবির মতো করে—

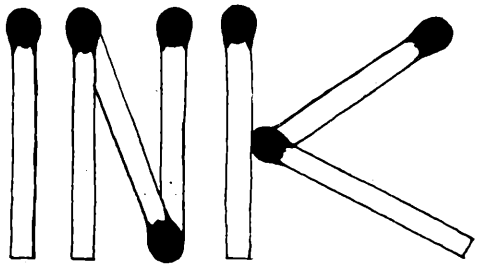

এবার কী হল ? তেল-এর বদলে কালি হল না ? আর, এর জন্য আগুন জ্বালাবার দরকার হল না, তাই না ?

বন্ধুদের আড্ডায় দেখিয়েই দ্যাখো একবার, বুঝবে কী দারুণ মজার খেলা এটা।

মজারু

হাসিখুশি

"নিরপেক্ষ কর্তার উদাহরণ দিতে পারো একটা ?"

"পারি কাকু। তুমি সাপের মুখেও চুমু খাও, ব্যাঙের মুখেও চুমু খাও।"

"টু ক্যারি কোলস টু নিউক্যাসল মানে হল তেলা মাথায় তেল দেওয়া। তুমি এরকম একটি উদাহরণ দিতে পারো পাপান ?"

"পারি স্যার। টু ক্যারি পেন্সিলস টু পেনিসলভ্যানিয়া।"

"কোন কোন বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে বলো তো ?"

"যে-বর্ণ উচ্চারণের সময় মহাপুরুষরাও প্রাণ বিসর্জন দেন।"

"চশমা নিলেও তুমি পড়তে পারবে না, এ-সন্দেহ তোমার হল কী করে ?"

"আমার যে এখনও বর্ণপরিচয়ই হয়নি ডাক্তারবাবু।"

"লটারিতে দু' লাখ টাকা পেলে তুমি কী করবে তাতান ?"

"আমি আর ইস্কুলে আসব না স্যার।"

"আপনার হোটেলের রান্নাঘরে খুব আরশোলা আছে, না ?"

"না তো ! আপনি জানলেন কী করে ?"

"রোজই খাবারের মধ্যে একটা না একটা থাকেই।"

"ক্যাশ কাউন্টারে ওরকম একটা লোককে বসিয়েছেন কেন, যার একটা চোখ আর একটা কান নেই ?"

"তা হলেই বুঝুন, তহবিল তছরুপ হলে ওকে খুঁজে বের করা কত সহজ।"

"ভাঙা হাড়টা দেখছি জোড়া লেগেছে ঠিকমতোই। এবার থেকে আপনি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারেন।"

"বাঁচালেন ডাক্তারবাবু। এই ক'মাস জলের পাইপ বেয়ে ওঠানামা করতে যে কী কষ্টই হচ্ছিল !"

ছবি : দেবাশিস দেব

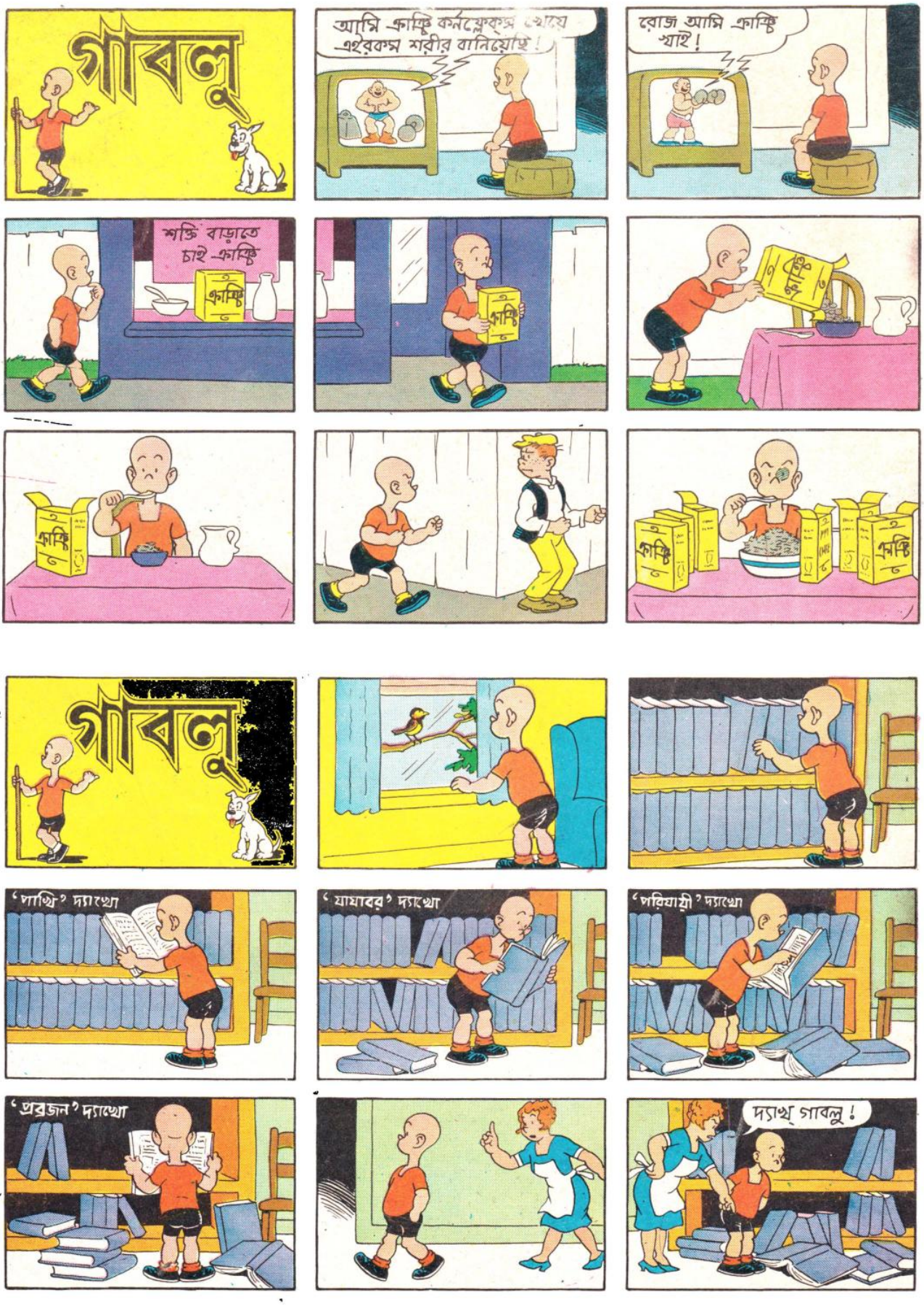
গাবলু
আমি ক্রাঞ্চি কর্নফ্লেক্স খেয়ে এইরকম শরীর বানিয়েছি!
রোজ আমি ক্রাঞ্চি খাই!
শক্তি বাড়াতে চাই ক্রাঞ্চি
ক্রাঞ্চি
গাবলু
'পাখি' দ্যাখো
'যাযাবর' দ্যাখো
'পরিযায়ী' দ্যাখো
'প্রব্রজন' দ্যাখো
দ্যাখ্ গাবলু!

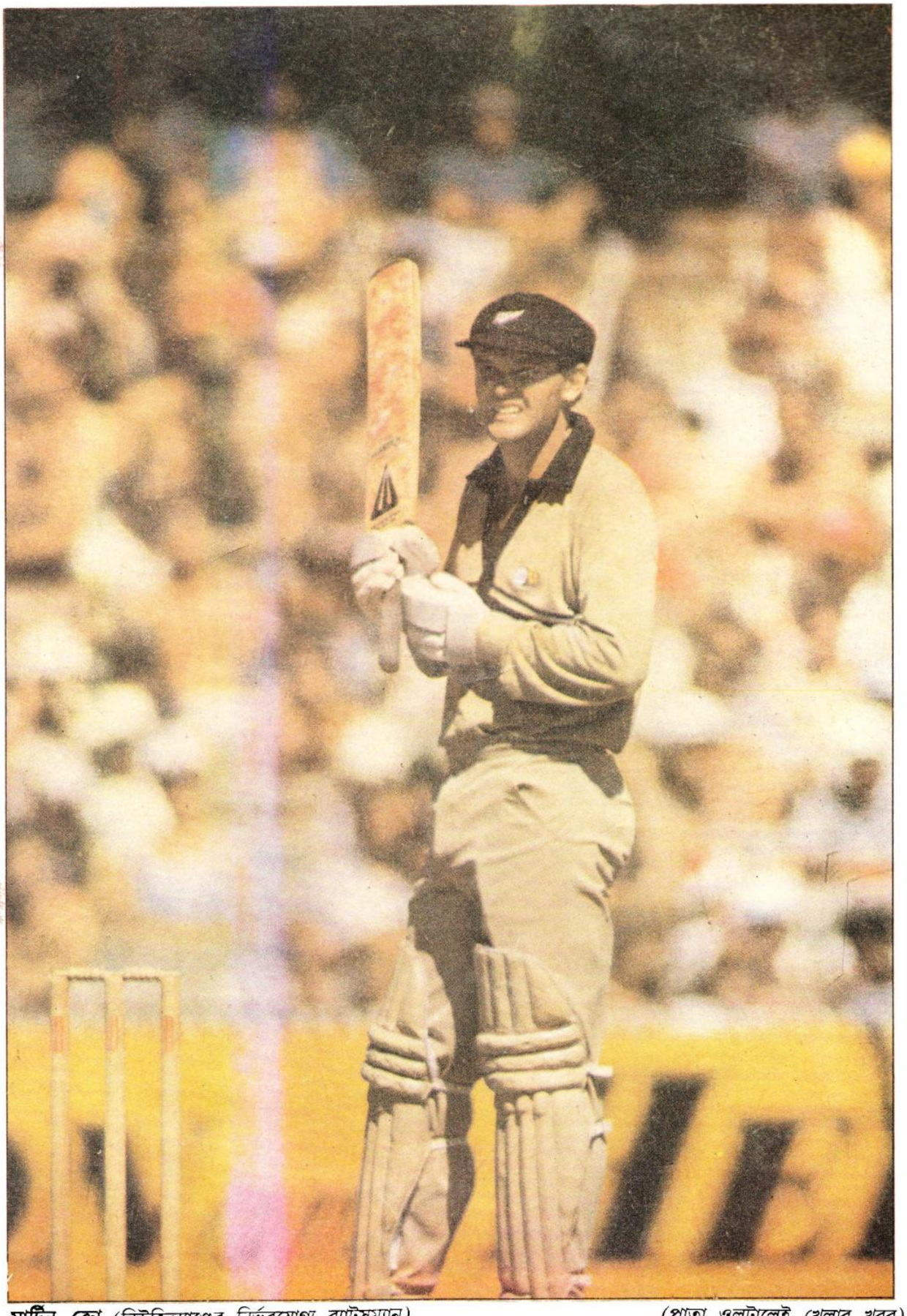

মার্টিন ক্রো *(নিউজিল্যাণ্ডের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান)*

(পাতা ওলটালেই খেলার খবর)

নিউজিল্যাণ্ডের সিরিজ জয়

মণীশ মৌলিক

অস্ট্রেলিয়া থেকে হাসিমুখে দেশে ফিরেছেন জেরেমি কোনি। তিনি গর্বিত। চল্লিশ বছরের ইতিহাসে আর কোনও অধিনায়ক যা পারেননি, তিনি তা পেরেছেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়াকে ২-১ ম্যাচে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছেন তিনি। রাবার। ব্রিসবেনে প্রথম টেস্ট জেতার পর সতীর্থরা তাঁকে কাঁধে করে প্যাভিলিয়নে নিয়ে এসেছিল। আনন্দিত কোনি অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জোরগলায় বলেছিলেন, "বুঝতেই পারছেন, নিউজিল্যাণ্ড দলকে এখন আর হেলাফেলা করা যাবে না।"

কোনির এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পিছনে দু'জন খেলোয়াড়ের অবদান অবিস্মরণীয়, রিচার্ড হ্যাডলি এবং মার্টিন ক্রো। কোনির ডান হাত এবং বাঁ হাত। ব্যাটে মার্টিন ক্রো যথাসাধ্য করেছেন। অধিনায়ককে তিনি লড়াইয়ের আশ্বাস দিয়েছেন আগাগোড়া। আর হ্যাডলি জয়ের পথ দেখিয়েছেন। আস্থা জুগিয়েছেন, আমি আছি। ব্রিসবেন, সিডনি, পার্থ, সাফল্যে ঘাটতি ছিল না কোথাও। প্রথম টেস্টে হ্যাডলি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লেন অস্ট্রেলিয়াকে। প্রথম ইনিংসে নয় উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে ছয়। এ ছাড়া রান করলেন ঘূর্ণিঝড়ের গতিতে। হ্যাডলির ভয়ংকর মূর্তি দেখে অস্ট্রেলিয়া দিশেহারা। ওদিকে ব্যাটিংয়ে দুর্ধর্ষ মার্টিন ক্রো, চকচকে ১৮৮। অস্ট্রেলিয়াকে কেউ ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারল না।

দ্বিতীয় টেস্টে সাত উইকেট নিলেন হ্যাডলি। এবং সিডনিতে প্রথম ইনিংসেই তিনি রেকর্ড গড়ে ফেললেন। নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে) এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহের নজির টপকে গেলেন হ্যাডলি। আগের টেস্টেই এক ইনিংসে নয় উইকেট নেওয়ার ঐতিহাসিক কর্মটি সেরে ফেলেছিলেন। মজাটা এই যে, সিডনি পিচ স্পিনের সহায়ক বলে দু'পক্ষই স্পিন-শক্তির বিপুল তোড়জোড় করল। অফ স্পিনার জন ব্রেসওয়েলকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ওদিকে কবর খুঁড়ে অস্ট্রেলিয়া তুলে আনল রে ব্রাইটকে। স্পিন নিয়ে এত হুড়োহুড়ির মধ্যে বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করে হ্যাডলি সাতটি উইকেট তুলে নিলেন। যদিও নিউজিল্যাণ্ড সে ম্যাচ হারল ৪ উইকেটে।

এবার পার্থ। শেষ টেস্ট। পার্থের পিচ বরাবরই পেস বোলারদের বন্ধু। অনুকূল পরিবেশে হ্যাডলি প্রথম ইনিংসে পাঁচটি ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দফায় ছ'জনকে। সাকুল্যে এগারোটি উইকেটের জন্যে তাঁকে খরচা করতে হয়েছে ১৫৫ রান। হ্যাডলির দামালপনা সামলাতে পারল না

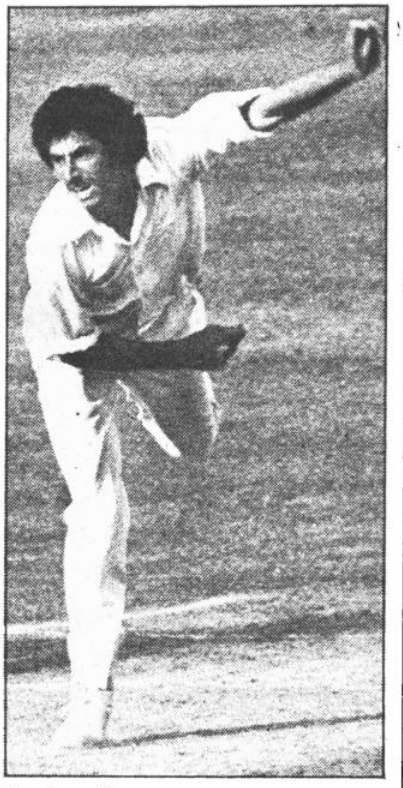

রিচার্ড হ্যাডলি

অস্ট্রেলিয়া। ছয় উইকেটে হারল ম্যাচে। সেইসঙ্গে সিরিজও। কোনি বলেছিলেন, হ্যাডলির ওপর তাঁর ভরসা অনেক। অধিনায়কের আস্থাকে তিনি সম্মানিত করেছেন ৩ টেস্টের সিরিজে মোট ৩৩টি উইকেট নিয়ে।

৩৩ উইকেট! অবিলম্বে বইয়ের পাতায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন পরিসংখ্যানবিদরা। লম্বা নাকওয়ালা লোকটা তা হলে একেবারে নাকাল করে ছেড়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। তিনটি টেস্টে ৩৩টি উইকেট তুলে নিয়েছে সে। পাঁচ টেস্টের সিরিজ হলে হয়তো সিড বারনেসের বিশ্বরেকর্ডও লোপাট করে দিত। সিড বারনেস ভাল মানুষ, ভ্রমণপ্রিয়, বন্ধুদের জন্যে অকাতরে খরচা করতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু সাদা ফ্লানেল-পরা এই লোকটিই মাঠের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়লে দ্রুতগতির বোলার, গম্ভীর, বাজে ফিল্ডার, এবং উইকেট ভাঙার শব্দ শুনতে দারুণ ভালবাসেন। ১৯১৩-১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে উইলি ডগলাসের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেছিল ইংল্যাণ্ড। সিড বারনেস সে-বার আতঙ্ক হয়ে উঠেছিলেন। ভয়াবহ বোলিং। ডারবানে ১০ উইকেট। জোহানেসবার্গে প্রায় একাই খুন করেছেন প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের। ১৭ উইকেট। তৃতীয় টেস্টে কিছু কম পেলেন, ৮। মন খারাপ। পুষিয়ে দিলেন চতুর্থ টেস্টে। চোদ্দটা। দক্ষিণ আফ্রিকার মাথার ওপর তখন একটাই কালো মেঘ। বারনেস। রাহুর মতো হাঁ করে আছে উইকেট গিলবার জন্য। চারটি টেস্টেই ৪৯টি উইকেট পাওয়া হয়ে গেছে। পোর্ট এলিজাবেথে শেষ টেস্ট। সেখানে আবার কী তাণ্ডব করেন কে জানে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেলর তন্দ্রাহীন।

কিন্তু না, স্বস্তি। শেষ টেস্টে বারনেস খেলছেন না। অসুস্থ। যাক, বাঁচা গেছে। শেষ অবধি দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য বাঁচেনি। দশ উইকেটে হেরেছিল তারা। তবে আর টেস্ট খেলেননি বারনেস। টেস্ট জীবনের তীরে এসে চারটি টেস্টে ৪৯ উইকেট নিয়ে এক সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেটপ্রাপকের যে সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন, তা আজও অম্লান।

আশির পরে হাসি

অশোক রায়

ক্রমাগত হারতে থাকলে সেই দেশ বা দল সম্পর্কে একটা হতাশা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ভারতীয় হকি সম্পর্কেও আমাদের মনে তেমনই এক ধরনের হতাশা তৈরি হয়ে গেছে। কারণ, হকিতে এক-কালের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান ভারত আজ ক্রমেই পিছু হটছে। অতীত সুনাম এখন এসে ঠেকেছে তলানিতে। ভারতীয় হকি নিয়ে মাথা উঁচু করে বলবার মতো এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভাবতে পারা যায়, '৮০ সালে মস্কো ওলিম্পিক গেমসের সোনাই ভারতের শেষ বড় জয়! ভাবা যায়, ষাট কোটি মানুষের বিশাল দেশ ভারতবর্ষ গত পাঁচ বছর হকিতে কোনও বড় টুর্নামেন্ট জেতেনি? এমনকী মাত্র ক'টা দিন আগে ছ'-দেশের চ্যাম্পিয়ানস কাপ হকিতে ভারত পেয়েছে সর্বশেষ স্থান।

না, এর পরেও ভারতীয় হকি নিয়ে স্বপ্ন দেখা সম্ভব ছিল না। অথচ কী আশ্চর্য, এই স্বপ্নহীন দিনগুলোর মধ্য দিয়েই ভারত আবার উঠে এল হকির শীর্ষ স্তরে। অপ্রস্তুত আনন্দের মধ্যে আমরা দেখলাম, ভারত জয় করল আজলন শাহ আন্তর্জাতিক হকি খেতাব। দুনিয়া শাসন করা হকি দেশগুলোর উপস্থিতিতেই ভারত জিতল। এবং বলা বাহুল্য, এই জয় ভারতীয় হকির সাইনবোর্ডে প্রায় মুছে-যাওয়া একটি শব্দকে ঝক্‌ঝকে রঙের আঁচড়ে আবার ফুটিয়ে তুলল। শব্দটি, আত্মবিশ্বাস।

মহম্মদ শাহিদ

চ্যাম্পিয়ানস ট্রফিতে শোচনীয় ফলের পরে আমরা হকির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। তাকালাম যখন, দেখলাম, এই টুর্নামেন্টে ভারত কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। চ্যাম্পিয়ানস ট্রফিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের শোচনীয় ফল এ খেলায় আমাদের নিরুৎসাহ করার জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সকলের উপেক্ষার মধ্যে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিল ৪-৩ গোলে। এই মুহূর্তে বিশ্ব-হকির সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে এই জয় নিঃসন্দেহে বিরাট কীর্তি। তবু উল্লাসকে প্রশমিত করতে হয়েছে সেমিফাইনালে পাকিস্তানের কথা ভেবে।

পাকিস্তান মানেই লড়াই, টেনশন। তবু, আবার জিতল ভারত। হরদীপ সিংয়ের গোলে ভারত হারাল ওলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস ও বিশ্ব-হকির চ্যাম্পিয়ান পাকিস্তানকে। এই জয় থেকেই আমরা বুঝতে পারছিলাম, নতুন কোনও মর্যাদা এবং সম্মানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত অপ্রতিরোধ্য গতিতে। ফাইনালে উদ্যোক্তা-দেশ মালেশিয়াকে হারাবার মতো দৃঢ়তা আগের দুটি ম্যাচ থেকেই অর্জন করেছিল ভারত। ফাইনালে তারা ৪-২ গোলে তছনছ করে দিল মালেশিয়াকে। কার্ভালিহো, টিক্কেন সিং, জুডে ফেলিক্স এবং অধিনায়ক শাহিদ, এই চার গোলদাতা দীর্ঘ ৫ বছর পরে ভারতকে উপহার দিলেন এক আন্তর্জাতিক হকি খেতাব। উদ্বেগ থেকে উল্লাসে ফিরল ভারতীয় হকি। অগৌরব এবং অসাফল্যের দীর্ঘ দিনগুলোর মতো আনন্দ এবং সাফল্যের দিনগুলোও দীর্ঘ হবে কি?

একটি টুথব্রাশ কিক'রে বিশেষ বলে গণ্য হয়?

বেশীর ভাগ লোকই ঐ বিষয়ে একেবারেই ভাবেন না—শুধু, যাঁরা ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন তাঁরা ছাড়া!

সব টুথব্রাশই সমানভাবে তৈরী করা হয় না—

ফরহ্যান্স টুথব্রাশ অন্যগুলির চেয়ে সেরা।

এর ডবল অ্যাকশন, একাধারে দাঁতও সাফ করে আবার মাড়িও মালিশ করে।

আপনি আপনার টুথপেস্ট বেছে নেন, খুবই যত্নভরে তাই না? তাহলে আপনার টুথব্রাশও ফরহ্যান্স-ই হওয়া উচিত কিনা বলুন!

ফরহ্যান্স

ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ

অ্যাডাল্ট, জুনিয়ার ও অ্যাঙ্গুলার ডিলাক্স

408-GM-241-BEN

ছিয়াশির আগাম সম্মান

সুব্রত সিংহ

ছিয়াশির আগাম সম্মান আদায় করে নিল ইস্টবেঙ্গল। পঁচাশিতে খেলা হলেও আসলে নাগজি ট্রফির এটি ছিল ছিয়াশির প্রতিযোগিতা। সাধারণত নাগজি ট্রফির আসর বসে বছরের গোড়ার দিকে। পঁচাশির প্রতিযোগিতা গত বছর গোড়ার দিকেই হয়ে গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে নেহরু কাপে খেলার জন্য ও আগামী এশিয়ান গেমসে দল

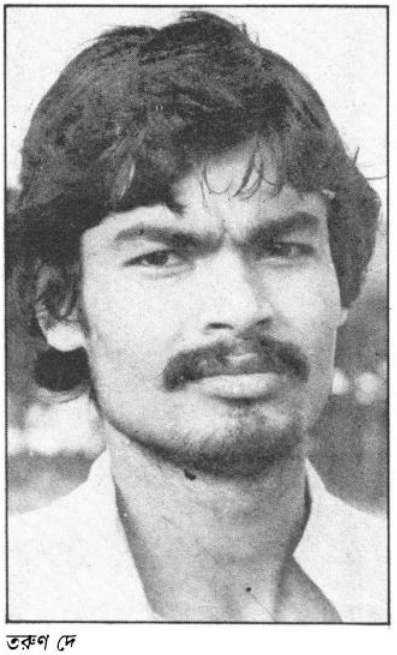

তরুণ দে

গঠনের জন্য প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকায় নামী দলগুলির খেলোয়াড়রা খেলতে পারবেন না। সেইজন্য এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিশেষ অনুমতি নিয়ে এ-বছরই ছিয়াশির আসর বসিয়েছিলেন।

ফাইনালে অনভিজ্ঞ প্রতিদ্বন্দ্বী কেরল একাদশকে কোনওক্রমে ১-০ গোলে হারিয়ে সতেরো বছর বাদে ইস্টবেঙ্গল এই ট্রফি ঘরে তুলল। এই আসরে ইস্টবেঙ্গল সাফল্য পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু কালিকটের ফুটবল-অনুরাগীদের খুশি করতে পারেনি। এ-বছর তাদের শক্তি ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু পুরো প্রতিযোগিতায় তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। সেই দার্জিলিং গোল্ড কাপে অংশ নেওয়ার পর দীর্ঘদিন বাদে তারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

কোয়ার্টার ফাইনাল লিগের গ্রুপের প্রথম খেলায় তারা দু' গোলে হারিয়েছিল দিল্লি অঞ্চলের ভারতীয় একাদশকে। কিন্তু দ্বিতীয় খেলাতেই তাদের ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়ে যায়

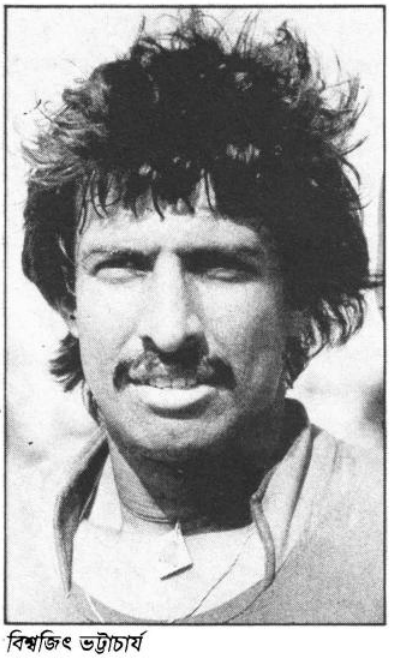

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

ভারতীয় একাদশ মাদ্রাজ অঞ্চলের বিরুদ্ধে। খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলেও মাদ্রাজ অঞ্চলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই দলটি সারাক্ষণই তারকা-সমৃদ্ধ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দাপটে খেলেছিল। তৃতীয় খেলায় সালগাঁওকরের পরিবর্তে প্রতিযোগিতায় খেলতে সুযোগ পাওয়া আই· টি· আইকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল সেমিফাইনালে খেলবার সুযোগ পায় গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে। পয়েন্ট সমান হলেও গোলের গড় হিসেবে ভারতীয় একাদশ মাদ্রাজ অঞ্চল পেয়েছিল প্রথম স্থান।

অন্য একটি গ্রুপে কলকাতার আর এক প্রধান মহমেডান প্রথম খেলায় হারিয়েছিল এবারের প্রতিযোগিতার রানার্স কেরল একাদশকে দু' গোলে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের মতো তারাও দ্বিতীয় খেলাতে ভারতীয় একাদশ কলকাতা অঞ্চলের সঙ্গে গোলশূন্য অবস্থায় খেলা শেষ করেছিল। আর তৃতীয় খেলায় মাদুরা কোট্সকে দু' গোলে হারিয়ে গ্রুপে প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল অপর গ্রুপের রানার্স ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, মাদুরা কোট্স এই প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেয়েছিল গোয়ার ডেম্পো স্পোর্টস প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায়। এই গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে কেরল একাদশ সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় একাদশ মাদ্রাজ অঞ্চলের বিরুদ্ধে।

ডবল লেগ সেমিফাইনালের দুটি খেলারই মীমাংসা হয়েছিল টাই-ব্রেকারে। আর দুটি ক্ষেত্রেই প্রথম লেগে এগিয়ে থাকা দল যথাক্রমে মহমেডান ও ভারতীয় একাদশ মাদ্রাজ অঞ্চলকেই শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হয়েছিল। প্রথম লেগে এগিয়ে থাকার সুবিধেটুকু ওই দুটি দলের কেউই বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি।

এই প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী দল বলতে ছিল ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান ও গোয়ার দুটি দল—সালগাঁওকর ও ডেম্পো স্পোর্টস। শেষ পর্যন্ত গোয়ার দল দুটি প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় প্রতিযোগিতার আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল কলকাতার এই দুই প্রধানের উপর। তাই অনেকেরই আশা ছিল, হয়তো এই দুই দলই শেষ পর্যন্ত ফাইনালে খেলবে। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি ইস্টবেঙ্গল তাদের গ্রুপের রানার্স হওয়ায়। আগেই উল্লেখ করেছি, এই দুই প্রধান সেমিফাইনালে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

ইস্টবেঙ্গল এই আসরে সফল হলেও, অপরাজিত থাকতে পারেনি। তাদের ডবল লেগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে হারতে হয়েছিল মহমেডানের কাছে। শেষ পর্যন্ত তারা উতরে যায় দ্বিতীয় লেগে খেলা শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে গোল করে। এরপর টাই-ব্রেকারে তারা জিতে ফাইনালে পৌঁছেছিল। আর ফাইনাল সম্পর্কে তো আগেই বলেছি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা দারুণ ফর্মে

রাজা গুপ্ত

এ খবর তো তোমরা জেনেই গেছ যে, শারজায় অনুষ্ঠিত রথম্যান'স কাপে তিন দেশের লড়াইয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। দুই এবং তিন নম্বর জায়গা দুটো পেয়েছে যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত। একদিনের ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সত্যিই শক্তিশালী দেশ। সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সম্প্রতি পাকিস্তানের সঙ্গে পাঁচটি ওয়ান-ডে ম্যাচের সিরিজে অংশ নিল।

প্রথম খেলা ছিল গুজরানওয়ালায়। ৪০ ওভারে পাকিস্তান করে ২১৮-৫। মুদাস্‌সর নজর ৭৭ এবং ইমরান খানের ৪৬ পাকিস্তান ইনিংসকে ভদ্র চেহারা এনে দেয়। কিন্তু শারজায় বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান ভারতকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছিল একেবারে টগবগে অবস্থায়। মাত্র ৩৫·৩ ওভারে দুই উইকেটেই ২২৪ রান তুলে নেয় তারা।

লাহোরে দ্বিতীয় খেলায় চমৎকার বদলা নিল পাকিস্তান, ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে। পাকিস্তানের লেগ স্পিনার আব্দুল কাদিরের বলে (৪-১৭) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মুখ থুবড়ে পড়ে ১৭৩ রানে। একমাত্র ভিভ রিচার্ডস (৫৩) ছাড়া আর কেউ ব্যাট হাতে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারেননি। পাকিস্তান ৪ উইকেট খুইয়েই ম্যাচ জিতে নেয়।

ভিভ রিচার্ডস

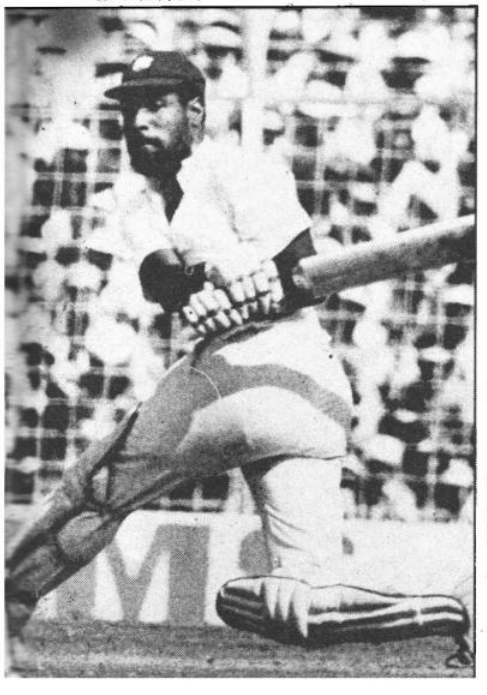

পেশোয়ারে পাশার দান উলটে দিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। আবার রিচার্ডস নামের ব্যাট-দানবটির বিক্রম জয় এনে দেয় তাদের। ৩৮ বলে ৪টি ছয় এবং ৫টি বাউণ্ডারির সহায়তায় রিচার্ডস ৬৬ রান করায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পৌঁছয় পাঁচ উইকেটে ২০১ রানে। রিচার্ডসকে যোগ্য সহযোগিতা দেন ডেসমণ্ড হেনেস (৬০)। পাকিস্তানের ইনিংস ১৬১ রানে শেষ করে দেন মাইকেল হোল্ডিং (৪-১৭)। সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এগোয় ২-১ ফলে।

রাওয়ালপিণ্ডিতে জবাব দেয় পাকিস্তান। ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে তারা সিরিজের ফল করে ২-২। ওপেনার রিচি রিচার্ডসনের অপরাজিত ৯২ রান সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৮ উইকেটে হারিয়ে ১৯৯-এর বেশি করতে পারেনি। রিচার্ডস ৫টি চার মেরে ২১ রানে আউট হওয়াতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর দাঁড়াতে পারেনি। তবে পাকিস্তান খুব সতর্কভাবে খেলে ৩৯·১ ওভারে অর্থাৎ খেলা শেষ হবার ৫ বল বাকি থাকতেই ৫ উইকেটে ২০৪ রান করে ম্যাচ জেতে।

করাচিতে খুবই উত্তেজনার মধ্যে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে ৩-২ ফলে সিরিজ করায়ত্ত করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোলারদের নিখুঁত আক্রমণের চাপে একসময় পাকিস্তানের রান ছিল ৩১ ওভারে ৪ উইকেটে ৮৭। বিরক্ত দর্শকরা অতঃপর মাঠে নেমে পড়ে এবং ইট ও কাঁচের বোতল ছুঁড়তে থাকে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক ফিল্ডারের গায়ে ইট লাগায় রেগেমেগে ভিভ রিচার্ডস তো দল নিয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড। পুলিশ যখন অবস্থা আয়ত্তে আনল, তখন কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। খেলার মেয়াদ কমিয়ে আনা হল ৩৮ ওভারে। এতে আরও অসুবিধে হল পাকিস্তানেরই। তাদের ৩৮ ওভারে রান উঠল ১২৭। জবাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দু' উইকেটেই ১২৮ রান তুলে নিল। আর সেইসঙ্গে জিতে নিল সিরিজ।

আপনার টুথব্রাশ আপনি কি ক'রে বাছবেন?

বেশীর ভাগ লোকই ও বিষয়ে মোটেই চিন্তা করেন না— শুধু, যাঁরা ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন তাঁরা ছাড়া!

সব টুথব্রাশই সমানভাবে তৈরী করা হয় না—

ফরহ্যান্স টুথব্রাশ অন্যগুলির চেয়ে সেরা।

এর ডবল অ্যাকশন, একাধারে দাঁতও সাফ করে আবার মাড়িও মালিশ করে।

আপনি আপনার টুথপেস্ট বেছে নেন খুবই যত্নভরে তাই না? তাহলে আপনার টুথব্রাশও ফরহ্যান্স-ই হওয়া উচিত কিনা বলুন!

ফরহ্যান্স

ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ

অ্যাডাল্ট, জুনিয়ার ও অ্যাঙ্গুলার ডিলাক্স

410-GM-241-BEN

দিব্যেন্দু দাবায় 'অর্জুন'

নৃপতি চৌধুরী

আমাদের দেশে খেলাধুলোয় সর্বোচ্চ পুরস্কার 'অর্জুন'। দিব্যেন্দু অর্জুন পেল দাবায়।

১৯৭২ সালে নেতাজি সুভাষ ইন্‌স্টিটিউটে ছ' বছরের ছোট্ট ছেলেটিকে দাবার টেবিলে হাজির থাকতে দেখে অনেকের মুখেই বিস্ময় এবং কৌতূহল জড়ো হয়েছিল। আবার মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে চলেও গিয়েছিলেন কেউ কেউ। উঁচু টেবিলের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছিল দিব্যেন্দুর ঝকমকে চোখ দুটো, যাতে একইসঙ্গে জড়িয়ে ছিল দাবার প্রতি আগ্রহ, ভালবাসা এবং স্বপ্ন। সেই টুর্নামেন্টে দিব্যেন্দু দাগ কাটবার মতো কিছু করেনি। তবে ওখান থেকে সে হারিয়েও যায়নি। ৬ বছর পরেই সে প্রচারের সার্চলাইট নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিতে পেরেছিল একইসঙ্গে তিনটি রাজ্য-খেতাব জয় করে।

সাব-জুনিয়র, জুনিয়র এবং রাজ্য-খেতাব জিতেছিল দিব্যেন্দু মাত্র ১২ বছর বয়সে। দাবার 'বিস্ময়-বালক' কথাটা তখনই চালু হয়ে গেল, কারণ তার আগে আর কেউ একইসঙ্গে তিন-তিনটি রাজ্য-খেতাব জেতেননি। দাবায় দিব্যেন্দু বড়ুয়ার পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠা তখন থেকেই।

দিব্যেন্দু থাকে মধ্য কলকাতায়। অজস্র প্রাইজ-ভর্তি অপ্রশস্ত ঘরটিকে ঘর না বলে কুঠরি বলাই ভাল। কানফাটানো শব্দ তুলে জানালার নীচ দিয়েই দিবারাত্র ছুটে যাচ্ছে বাস, মিনি বাস, ট্যাক্সি। ওরই মধ্যে কঠিন মনঃসংযোগের খেলায় নিয়োজিত থাকে ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা দাবাড়ু দিব্যেন্দু। সঙ্কীর্ণ চার দেওয়ালের মধ্যেই সে স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার। ওরই মধ্যে মৌলানা আজাদ কলেজের ইকনমিক্সের ছাত্র দিব্যেন্দু চালিয়ে যাচ্ছে অধ্যয়ন।

দিব্যেন্দু কোথায় কোথায় খেলেছে, কী কী প্রাইজ পেয়েছে, সে-কথা সব লিখতে গেলে 'মিনি' মহাভারত হয়ে যাবে। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কোন ম্যাচ তোমাকে সবচেয়ে তৃপ্তি দিয়েছে, খুশি করেছে ?" চশমার কাঁচের মধ্যে দিব্যেন্দুর চোখ মুহূর্তে ফিরে গেল অতীতে। রাজা, মন্ত্রী, গজ, নৌকা, ঘোড়া আর বোড়েতে সাজানো সাদা-কালোর দাবা-বোর্ড থেকে সে তুলে আনল একটি নিপুণ যুদ্ধ-জয়ের ঘটনা। '৮২ সালে লন্ডনের লয়েডস ব্যাঙ্ক টুর্নামেন্টে সে হারিয়েছিল ভিক্টর করশনয়কে। করশনয় তখন বিশ্বের দু'নম্বর দাবা খেলোয়াড় (আর আনাতোলি কারপভ এক নম্বর)।

"বড় বড় দাবাড়ুরা এবং সমালোচকরা প্রায়ই অভিযোগ করেন, তোমার খেলা শুরু করার ধরনটা ভাল নয়। অথচ তোমার মিডল গেম বা এন্ড গেম খুব ভাল। ত্রুটিটা সারিয়ে নিতে পারছ না কেন ?" আমার প্রশ্নে দিব্যেন্দু জানাল, "যতখানি সময় এর জন্যে দেওয়া দরকার তা দিতে পারছি না। তার ওপর এখানে আমার প্র্যাকটিস পার্টনারও তেমন কেউ নেই। বিদেশের ভাল কোচের খরচও বিরাট। তবু চেষ্টা করছি, দেখা যাক।"

দিব্যেন্দু যাতে আরও এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য আমরা অনেকেই ভেবেছি। কিন্তু শুধু ভেবেছি, তার বেশি আর কিছু নয়। বাংলার গর্ব এই ছেলেটিকে আমরা লালন করেছি অযত্নে। দিব্যেন্দুকে বড় চাকরির সুযোগ দিয়েছে টাটা কোম্পানি। বড় দাবাড়ু হবার স্বপ্ন নিয়ে সে অনেক অপেক্ষার পর চলে যাচ্ছে বাংলা ছেড়ে। আমরা কেউ ওকে আটকাতে পারলাম না।

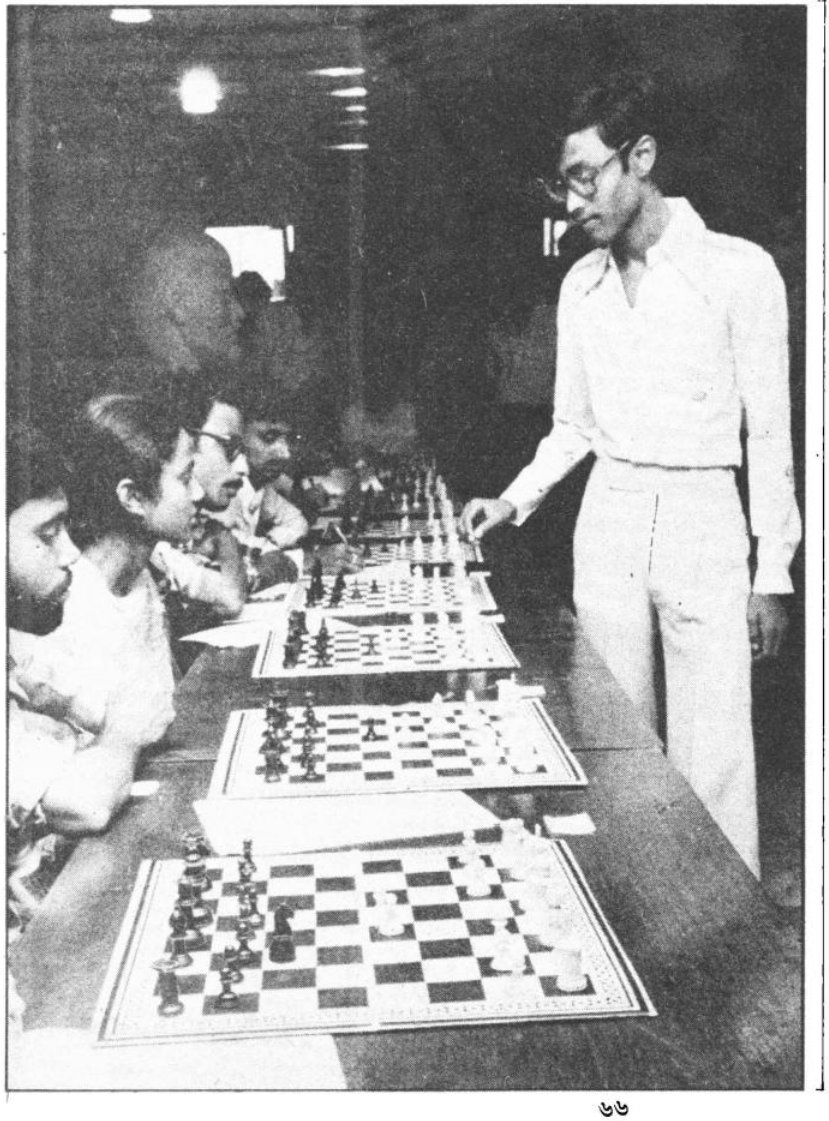

খাটা খাটনি তো সবার লেগেই আছে! আমার স্বামীর অফিস, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ, আর আমার হাট-বাজার করা। তাই আমরা নিয়ম করে অন্তত হরলিক্স টুকু রোজ সবাই খাই।
হরলিক্স আমাদের পরিবারের সকলেরই সাথী।
হরলিক্স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।
Horlicks
The Great Nourisher
নতুন যুগের নতুন রূপে
piccadily Restaurant
KAMAL READYMADE
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়
HTD-HMM-8072BEN

Anandamela 8 January 1986. Regd. No. WB/CC/264. MH By-South
683TN/MS(c)/731

এবার আপনি কেয়ো-কার্পিন চুলে নতুন নতুন রূপে প্রতিদিন

টপনট বাঁধার দিন

বিনুনী বাঁধার দিন

খোঁপা করার দিন

পোনি টেলের দিন

চুল খুলে রাখার দিন

ফ্রেঞ্চ রোলের দিন

ইচ্ছে মতন বাঁধার দিন

আপনার চকচকে সুন্দর কেয়ো–কার্পিন চুল নিয়ে যা খুশী তাই করুন।

কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল আপনার চুলের পুষ্টি যোগায় অথচ মাথায় তেলমাখা চটচটে ভাব আনে না। চুল থাকে সুন্দর, পরিপাটি।

আধুনিক সাজে সাজতে হলে তাই আর তেলমাখা বন্ধ করতে হবে না। রোজ কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল মাখুন–চুল থাকবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুগন্ধী। আর সপ্তাহের প্রতিদিন নতুন ধাঁচে চুল বেঁধে নতুনরূপে নিজেকে আবিষ্কার করুন।

আপনার চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখে অথচ চটচটে করে না।

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল

১০০ এবং ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়

Dey's যাদের যত্নই আপনার আস্থা

CLARION C-DMHO-2